সচিত্র

(রোমাঞ্চকারী ছোটদের উপন্যাস)

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বি, সিংহ এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

২০৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রকাশক

ললিতমোহন সিংহ

বি, সিংহ এণ্ড কোং

২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥

দাম বার আনা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ

নিউ সরস্বতী প্রেস

২৫।৩।এ শম্ভু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

উৎসর্গ পত্র

শ্রীমান্ কাঞ্চন কুমার মুখোপাধ্যায়ের করকমলে—

কাঞ্চন—

আমার এই বইখানি লিখিবার সময় তুমি আগ্রহ সহকারে পড়িয়া দেখিয়াছ, তোমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। আজ তোমারই হাতে তুলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বাংলার খোকাখুকুদের নিকট আদর পাইলে কৃতার্থ হইব।

১লা আশ্বিন
১৩৪২ সাল॥

ইতি—
শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুহ-রত্ন।

"পশ্চিমে—বহু দূরে—সোণারহাটী গ্রাম। এক—ডাকাতের বাড়ী। অ-নে-ক টা-কা ধন-রত্ন।—তু-ই-ই পাবি। সাবধান —দেখিস্—বিপদ্—অ-নে-ক।"

বর্ষাকাল! সারাদিন টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়্ছিল। সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। কল্কাতা সহরের রাস্তাঘাট যেন নীরব নিস্তব্ধ। সেদিন ছিল মোহনবাগানের খেলা। ফুটবল খেলার নামে কল্কাতা সহরের কি ছেলে কি বুড়ো, বিড়িওয়ালা, এমনকি রাস্তার কুলীরা পর্য্যন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠে। তা'র ওপর আবার মোহনবাগান টীমের নাম না জানে এমন লোক বোধহয় কল্কাতায় পাওয়া ভার।

সেই মোহনবাগান আবার জল বৃষ্টিতে ভাল খেল্তে পারে না। যেদিন তা'রা খেল্বে সেদিন যদি বৃষ্টি হয় তা'হলেই সকল লোকের চক্ষু-স্থির। মোহনবাগান যে কোনও টীমের সাথে হার্তে পারে একথা কেউই বিশ্বাস করতে চায় না। হয় রেফারীর পার্সিয়াল্টী, না হয় জল বৃষ্টি' একটা না একটা ওজুহাত থেকে যায়। তথাপি মোহনবাগান দিগ্বীজয়ী টীম।

যাক্ যেদিনটার কথা আমি বল্ছি, সেদিন ছিল আই, এফ, এ শীল্ডের সেমি-ফাইন্যাল। ক্যাল্কাটা ও

মোহনবাগান। এই খেলায় মোহনবাগান জিত্‌তে পারলে তা'র শীল্ড লাভ করবার একটা মহাসুযোগ। সারাদিন বৃষ্টি পড়ার দরুণ মোহনবাগানের হারবার সম্ভাবনাটাই খুব বেশী। তথাপি যা'দের খেলা দেখ্‌বার সখ আছে, তা'রা কি আর মাঠে না গিয়ে বাড়ীতে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে। রমেশের মন্‌টাও কেমন কেমন ঠেক্‌ল।

সে মনে মনে বল্‌লে—"আজ মোহনবাগান যখন হেরে যাবে, তখন আর জল বৃষ্টিতে ভিজে লাভ কি? তা'র চেয়ে বাড়ীতে ব'সে ক্যারম্‌ খেল্‌লেও কাজ হ'বে।" শৈলেনের গলার আওয়াজ শুনেই রমেশ থম্‌কে দাড়াল।

"এত শীগ্‌গীর বাড়ীতে ফিরছিস্‌ কেন রে?" শৈলেন বল্‌লে।

শৈলেনের কথার উত্তর দিতে গেলে তা'কে আরও খানিকটা ভিজ্‌তে হ'বে, তা'ছাড়া হয়ত মাঠে টিকিট পাওয়া যা'বে না।

তাই ভেবে রমেশ আর দাঁড়ালো না। সরাসর বাসার দিকে। শৈলেন ও সোজা পাত্র নয়। সেও আর সহজে ছেড়ে দিচ্ছে না। সে দৌড়ে গিয়ে ধ'রে ফেল্লে।

রমেশ আর কি ক'রে! একে ক্লাশফ্রেণ্ড্, তাতে আবার এক পাড়াতেই থাকে, একসঙ্গে ক্যারম্ খেলে। তবে কিনা শৈলেন ওর চেয়ে বয়েসে ২।৪ বছরের বড়। রমেশ ত' একেবারে ছেলেমানুষ। কলেজে পড়ে বটে, চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে মনে হয় যেন স্কুলে নীচের ক্লাশে টাশে পড়ে হয়ত। বয়েসের সঙ্গে ত' আর দেহের গঠনের মিল নেই। অনেক সময় অল্প বয়েসের লোককেও বেশী বয়েসের বলে মনে হয়, আবার কোনও কোনও সময় বেশী বয়েসের লোককেও অল্প বয়েস বলে মনে হয়।

যাহোক্ রমেশ শৈলেনের সঙ্গে কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বাসায় ফিরছিলো। রাস্তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে যে ৪টা বেজে গেছে। সাড়ে ৫টায় খেলা সুরু হবে। এদিকে মন্থর গতিতে গেলে আর খেলা দেখা হয়ে উঠ্‌বে না, কাজেই খুব তাড়াতাড়ি পা বাড়াতে লাগ্‌ল। বাসায় ফিরে চট্‌পট্ হাত মুখ ধোয়া ও জলখাবারটাও সেরে নিয়ে ২ জনেই চল্‌লো, গড়ের মাঠে খেলা দেখ্‌বার জন্যে। বৃষ্টি তো আর থাম্‌ছে না। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই এক রকম খেলা দেখা। মাঠে অসংখ্য লোকের ভীড়। সেই ভীড় ঠেলে শৈলেন ও

রমেশ গিয়ে বস্‌ল গ্যালারীতে। যথা সময়ে খেলা আরম্ভ হ'য়ে গেল। শেষকালে মোহনবাগানেরই জয় হল। দর্শকগণ সকলেই বেশ হাসিমুখেই বাড়ী ফির্‌ল। বৃষ্টিতে ভিজে প্রায় সকল লোকেরই জামা কাপড়ের যে দুর্দ্দশা তা'তে এই খেলা দেখ্‌বার সখটা বোধহয় না থাক্‌লেই ভাল হ'ত। কিন্তু সে ভিজাটা'ত মাত্র একদিনের জন্যে। শৈলেন সোজাসুজি বাসার দিকেই চল্‌ল। রমেশ আর বাসায় না ফিরে করপোরেশন ষ্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

চৌরঙ্গি ও করপোরেশন ষ্ট্রীটের মোড়েই একটা চায়ের দোকান আছে, সেই দোকানটার নাম ময়দান কেবিন। রমেশ ময়দান কেবিনে ঢুকে পড়ল, চা, বিস্কুট ইত্যাদি খাবার জন্যে। আমি তখন সেই দোকানে বসেই চা পান কর্‌ছিলাম। রমেশের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু সেদিন সেই খেলার কথা নিয়েই তা'র সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। এককথা দু'কথা করে তা'র সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জম্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রিটাও বাড়্‌ছিল। বৃষ্টিও কিছুতেই কম্‌ছে না দেখে আমরা দু'জনে একত্র হয়েই রওয়ানা হ'লাম বাসার দিকে। রমেশদের বাসা ছিল মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে। আমাদের

বাসাও ওরই কাছে। কাজেই দু' জনে নানা রকম গল্প বল্‌তে বল্‌তে হাট্‌ছিলাম। দু' জনে গল্প করতে হেটে চলা খুবই সহজ। তা'তে পরিশ্রমটাও একটু কম কম বলে বোধ হয়। জনমানবশূণ্য পথে একাকী হাটায় যেরূপ পরিশ্রম হয়, আর জনবহুল কলিকাতা নগরীতে দু' জন লোক একসঙ্গে হাট্‌লে পরিশ্রমের বহরটা একটু কম বলেই মনে হয়।

রমেশদের বাসার কাছে এসে আমি সঙ্গীহীন হয়ে পড়্‌লাম। রমেশ তা'দের বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌ল। আর আমি আমাদের বাসার দিকেই রওয়ানা হলাম। আমাদের বাসা ছিল মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটেরই একেবারে কাছাকাছি ব্রজনাথ দত্ত লেনে। আমি যে বাড়ীতে ছিলাম সে বাড়ীতে আমরা মাত্র চারটী প্রাণী। এর আগে অবশ্য আরও অন্যান্য লোক ছিল। কিন্তু সেই সময় মাত্র আমরা চার জনে থাকুতাম। আমার পিসিমা, তার ছেলে, অর্থাৎ আমার দাদা, আমার বৌদি আর আমি। আমার দাদা তখন মেডিকাল কলেজের ডাক্তার। তা'ছাড়া বাইরের রোগীও ২।৪টী ছিল। বাসায়ই ডিস্‌পেন্‌সারী। তবে সেই ডিস্‌পেন্‌সারীতে কোন কম্পাউণ্ডার ছিল না। দাদা নিজেই ওযুধপত্র তৈয়ারী করতেন। শুধুশুধি

একটা লোককে মাইনে দিয়ে রাখার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। রোগী নেই, পত্র নেই তবুও একটা কম্পাউণ্ডার রাখ্‌তে হ'বে বাইরের ঠাট্‌ বজায় রাখ্‌বার জন্যে। এ সকল বিষয় তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

ছোট্ট গলি দিয়ে লোকজনের যাওয়া আসা খুবই কম। গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি কোন রকমের যান বাহন সে গলির মধ্যে ঢুকতে পারে না। পাশাপাশি দু' জন লোক যাওয়াও কষ্টকর। রাত তখন প্রায় ৮টা হবে, সমস্ত কল্‌কাতা সহরেও বোধ হয় এমন একটা গলি মেলে না। একে ত' ছোট গলি, তা'তে আবার সারাদিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত বাড়ীরই লোকজন যে যাহার ঘরে বসে আছে, বাহিরে বের হওয়া ত' দূরের কথা, এমনকি যে যাহার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আমাদের বাসায় এসে বাইরে থেকে পিসিমা পিসিমা ব'লে ডাক দিয়ে কোন সাড়া পেলাম না। পিসিমা ও বৌদি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন; খুব জোরে কড়া ধরে নাড়া দিয়েও কোনই প্রতি উত্তর পেলাম না। বাড়ীখানি যেন নিস্তব্ধ। বাড়ীতে কি কোন লোক নেই? বাইরে থেকে ত' মনে হয় না যে এ বাড়ীতে কোন জনপ্রাণী আছে বা কোনও কালে ছিল।

বাইরের ঘরের জানালাও বন্ধ, জানালার খড়খড়ি উঠিয়ে দেখ্‌লাম যে সে ঘরে কোনই লোক নেই বা একটী কেরোসিনের আলোও নেই। আমার দাদা হয়ত সন্ধ্যার আগেই বেরিয়েছেন, সেই কারনেই বোধ হয় পিসিমা বা বৌদি একটা আলো রেখে যেতে ভুলে গেছেন। আমি এক মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। বেশী জোরে কড়া নাড়্‌লে যদি তা'দের ঘুম ভাঙ্গে, এই ভেবে প্রাণপণ শক্তিতে কড়া নাড়্‌ছিলাম। কিন্তু সে কড়া নাড়ার শব্দ যে কাহারও কাণে পৌঁছেছে এমন মনে হয় না।

প্রায় আধঘণ্টা খানেক কড়া নেড়ে হয়রান হয়ে গেছি, এমন সময় হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুলে দেখি যে আমার পিসিমা দাঁড়ান। অন্ধকারের মধ্যে আর তা'র মুখখানা দেখা গেল না, মাত্র তা'র পড়নের সাদা ধব্‌ধবে কাপড়খানা দেখা গেল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সাম্নেই একটা সিড়ি, সেই সিঁড়িদিয়ে দোতলায় উঠ্‌তে হয়। একতলায় দাদার ডিস্‌পেন্‌সারী ঘর। একতলায় আর কোন ঘর নেই। আমি পিসিমাকে দরজা বন্ধ করতে বলে আস্তে আস্তে হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। যতক্ষণ

পর্য্যন্ত না উপরে উঠে আমার ঘরের আলো জ্বালাব ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক অন্ধ মানুষের মত হাতড়াতে হ'বে। পাশাপাশি দু'জন লোক থাকলে একজন অপরকে দেখ্তে পায় না। সারা দুনিয়ার জমাট অন্ধকার সেই সিঁড়ির গোড়ায় কুণ্ডলী পাকীয়ে আছে। পিসিমা সদর দরজাটা বন্ধ করলেন। দরজা বন্ধ করার শব্দ আমার কাণে আস্ল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পিসিমাকে, আর দেখা যায় না।

দোতলায় আমার ঘরের সাম্নে একখানি চওড়া বারান্দা। সেই বারান্দায় ২।৩ জন লোক ঘুমাতেও পারে। বারান্দারই সঙ্গে যে ঘরখানি আছে সেই ঘরে আমি থাকি। আর আমার দাদা থাকেন তিন তলায় একখানি ছোট্ট ঘরে। দাদা যে ঘরখানিতে থাকেন সেই ঘরে হাওয়া বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যদিও সে ঘরখানি ছোট। তথাপি সে ঘরটি স্বাস্থ্যকর। এক পা এক পা করে সিঁড়ির ধাপ গুণোকে উত্রে বারান্দায় পা দিতেই যা দেখ্লাম সে কথা এখন মনে উঠ্লে গা শিউরে উঠে। আমি আর একপা'ও এগোতে পারছি না। আমার পা দুখানিকে যেন কে জাপ্টে ধরেছে। চোখের সাম্নে দিয়ে যেন একটা কালো

পরদা সরে দাঁড়িয়েছে। ভয় ও বিস্ময় আমার ঘাড়ে চেপেছে। মনটাকে শক্ত করে বেঁধে ফেল্‌লাম। ভয় বেটাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিলাম। পিসিমাকে ডেকে জাগালাম। পিসিমা ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বস্‌তেই আমি তাকে জিজ্ঞেস্‌ করলাম—"দরজা কে খুলে দিলে পিসিমা ?" আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় কথা বের হ'ল না। তবুও আমি আবার বল্‌লাম যে "আমার ধারণা ছিল যে তুমিই দরজা খুলে দিয়েছ। কিন্তু এখন তোমাকে শোয়া দেখে আমার সারা গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। বউদিকে বল্‌লে হয়ত তিনি ভয়েতে অস্থির হয়ে পড়বেন।" পিসিমা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে হ্যারিকেন্‌টা ধরালেন। আমি সেই হ্যারিকেন্‌টা নিয়ে নীচে নেমে দরজার সাম্নে গিয়ে দেখ্‌লাম যে দরজা বন্ধ। দরজাটা কেই বা খুল্‌লে আর কেই বা বন্ধ করলে ? সেই বাড়ীটি যে ভূতের বাড়ী এই সকল বিষয় নানা গল্প শুনেছি। কিন্তু চক্ষে ত' এমন কোন দিন দেখিনি। আজ চোখের সাম্নে একটা আস্ত ভূতকে দেখে আমি ভয়েতে মুস্‌ড়ে পড়লাম। পাড়াগাঁয়ে অনেক ভূত থাকে, কল্‌কাতা সহরে যে কোন ভূত থাকতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। বৌদিকে আর এসব কথা কিছুই বল্‌লাম না।

২

পরদিন পাঁড়ায় সকলের কাছেই এই ভূতুড়ে ব্যাপার সম্বন্ধে বল্‌তেই তারা সব বল্‌লে যে এই বাড়ীটা অনেক দিন থেকেই প'ড়ে আছে, কেউ এ বাড়ীতে আস্‌তে চায় না। ভূতের অত্যাচারে আমরাও এ পাড়াতে আর টিক্‌তে পারছি না। কিন্তু আমাদের বাড়ী ঘর দোর ছেড়েই বা যাব কোথায় ?

পাড়ার সকলের মুখেই ভূতের কথা শুনে আমারও যেন ভয় ভয় কর্‌ছিল। আমি আর সে বাড়ীতে থাকা বিবেচনা করলাম না। তাই দাদার কাছে খুলে বল্‌লাম আমার মতামত।

দাদা আমাকে একটা ধমক দিয়ে বল্লেন—"রেখে দে তোর ভূত টুত, ওসব ভূত আমি একদিনে শেষ করে দিতে পারি।" দাদার কথার উপর আর কোনও কথা বলার সাহস আমার ছিল না। কাজেই আমি চুপ করে গেলাম। আমি আর কোনওরূপ উচ্চবাচ্য না করে সেদিনকার মত কথাটাকে চাপা দিয়ে গেলাম।

এইরূপে কিছুদিন যায়, আমরা আর সে বাড়ী ছেড়ে কোথাও গেলাম না। সেই বাড়ীতেই বেশ নির্ব্বিবাদে অনেকদিন কেটে গেল। এতদিন আর কোন ভূত

টুকু চোখে পড়েনি। কিন্তু একদিন এমন একটা সুযোগ এসে জুটে গেল, যে সুযোগের অপেক্ষায়ই এতদিন ছিলেম।

—একদিন—

রাত তখন প্রায় এগারটা হবে। চৈত্রমাস, গরমটা একটু বেশী রকমেরই হয়েছিল। তাই আমি একটা মাদুর আর বালিশ নিয়ে ছাদে গিয়ে ঘুমাবার জোগাড় করলাম। পিসিমা দোতালার ঘরে শুয়ে রইলেন। ছাদে উঠ্‌বার সিঁড়ির কাছটাতেই আমি বিছানা-ক'রে শুয়ে পড়্‌লাম। বিছানায় শুয়ে আকাশের পানে চেয়ে নক্ষত্রগুলি দেখ্‌ছিলাম। তখন বোধহয় পূর্ণিমা-টুর্ণিমা হবে তাই চাঁদ তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীময়। নানা-রকমের চিন্তা এসে আমার মনকে অধিকার করে বসেছে। ঘুম আর কিছুতেই আসে-না। একদিকে আমার একটা চিন্তা রয়েছে যে সদর দরজা বন্ধ, দাদা বাইরে "কল্" এ গেছেন। বাড়ীতে আমরা মাত্র ৩টী প্রাণী। বৌদি এতক্ষণে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। পিসিমাও দেখ্‌ছি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যদি না ঘুমোই, তবেও আমার বড্ড ভয় করবে নিশ্চয়। একে ত' ভূতুড়ে বাড়ী তার উপর

আবার আমি একাই জাগ্রত। আমার সাথে কথা বল্‌বার দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই। অগত্যা আমার ঘুমানোই উচিৎ ভেবে চোখ বুজে রইলাম। কিন্তু পোড়া চোখে যে ঘুম আর আসে না। কত রকমের ছাই, ভস্ম, দুশ্চিন্তা এসে স্থান করে নিয়েছে আমার মনের কোনে। দুশ্চিন্তার বোঝাকে জোর করে নামান ছাড়া আর গতি নেই দেখে ধরমড়িয়ে বিছানায় উঠে বস্‌লাম। এমন সময় আমার কাণে এসে ধাক্কা মার্‌ল একটা অস্পষ্ট শব্দ। দুপ্‌ দাপ্‌ শব্দে চম্‌কে উঠ্‌লাম। আমার মনে হল যে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কেউ ছাদে উঠ্‌ছে।

শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। ভাব্‌লাম যে দাদা হয়ত উপরে উঠ্‌ছেন। দাদা যে ঘরে থাকেন সেই ঘরটা ছাদেরই এক্‌কোণে, সেই সিঁড়ী দিয়েই উঠ্‌তে হয়। কাজেই আমার আর কোন সন্দেহই হতে পারে না যে এ দাদা ছাড়া আর কেউ হ'তে পারে। হয়ত পিসিমা সদর দরজা খুলে দিয়েছেন এই সব সাত পাঁচ ভেবে সিঁড়ির দিকেই তাকিয়ে রইলাম। মিনিট খানেক পরে তাকিয়ে থাক্‌বার পর যা দেখ্‌লাম, তা বল্‌তেও আমার গা শিউরে ওঠে। একটা ভীষণ আকৃতির মাথা হা—করে আমাকে গ্রাস্‌ করতে আস্‌ছে।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। রাক্ষসের মত মুখের হাঁ—। সে দৃশ্য একটা ভয়ানক। যে কোনদিন দেখেছে, সে ছাড়া আর কেউ বুঝ্‌তে পারবে না। প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম যে এটা কি আমার চোখেরই ধাঁধাঁ? না—সত্যিকারের ভূত। আমাকে আর ভাব্‌তে সময় না দিয়ে একেবারে আমার সাম্নে এসে হাজির। একটা ভীষণ গোঙ্গানি শব্দ কেবলই আমার কাণে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। ভয় আমি মোটেই পেলাম না। ভয় পেলে হয়ত আমার ঘাড়ের ওপরই চেপে বস্‌ত।

আমি আমার পৈতা গাছটাকে ধরে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতেই একটা বিকট হাসি শুন্‌তে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে এমন শব্দ হ'তে লাগল যেন দু'টী বীর যুদ্ধ কর্‌ছে। সেই ভীষণ আকৃতির মাথা আমার ঠিক মাথার উপর একটা ঘুরপাক্ খেয়ে আমার পায়ের কাছে দুপ্ করে পড়ে গেল। সেই পড়ে যাওয়ায় একটা শব্দ হ'ল। শব্দটী আকাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে যখন বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে তখন আমি মাত্র এই ক'টি কথা শুন্‌লাম।—

"পশ্চিমে—বহু দূরে—সোণারহাটী গ্রাম। এক—

ডাকাতের বাড়ী। অ-নে-ক টা-কা ধন-রত্ন।—তু-ই-ই পাবি। সাবধান—দেখিস্—বিপদ্—অ-নে-ক।”

আধ আধ ভাষায় কয়েকটা শব্দ কাণে ঢুকল। কিন্তু তার অর্থ ই বা কী! এর যে কোন মানে হ'তে পারে তা মনে হয় না। একে ত' ভূত, তার ওপর আবার তা'দের কথা সেই কথাকে আবার বিশ্বাস করা, এটা তো আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। ছেলেবেলা থেকে কোনও দিন ভূত বিশ্বাস করিনি। যে সকল ভূতের বই পড়েছি সবগুলিকেই জীবন্তে কবর দিয়েছি। আজ সেই ভূতেরই কথাকে আমায় বিশ্বাস করতে হ'বে এ হতেই পারে না। যাক্ ভূতের হাত থেকে তো রেহাই পেলাম। এখন পুরামাত্রায় পড়া শুনায় মন দেওয়া যাক্। সেই হতে আর আমার মনে কোনই ভয় রইল না। আমি বেশ মনের সুখেই পড়া শুনা করতে লাগলাম। বাড়ীতে ঢুকেও গা রি-রি-করত না। এই বাড়ীতে ঢুকে অবধি একটা ভয় ভয় ঠেক্ত। এখন সে ভয় গেল চুকে। আমার দাদা আবশ্যি আমায় অনেক কথা বল্তেন। তখন দাদার কথায় সায় দিয়েই যেতাম, কিন্তু মনের কোণে একটা ভয় এসে উঁকি মারত। দাদা এও বল্তে ছাড়তেন না যে ভূত বলে জগতে কোন কিছু নেই। ওটা

শুধু মনের ভয় ও ভ্রান্তিক। ভূত বল্‌তে মাত্র পঞ্চ-ভূতকেই বোঝায়, এই পৃথিবীতে মাত্র ৫টা ভূত আছে। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। যাকে কেন্দ্র করেই বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা কলকজা সব আবিষ্কার করেছেন। দাদার কথা শুনে আমি শুধু তাকিয়ে থাকতাম তার মুখের দিকে। আর আজ আমি যে একটা ভূত আবিষ্কার করে ফেল্‌লাম, যে ভূতের দ্বারা হয়ত আমাদের কোন উপকার হতে পারে।

বছর কেটে গেল আমরা সে বাড়ী ছাড়ছি না দেখে পাড়ার সব লোক আমাদের এক একটা আস্ত ভূত বলে ঠাউরে নিল। আমরা ত আর ভূত নই, তবুও তাদের বিশ্বাস হয়েছিল, যে—যে বাড়ীতে ভূত আছে, সেই বাড়ীতে আমরা বাস করি কেমন করে?

—এদিকে—

আমরা যে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছি এ শুনে তারা সকলেই বলাবলি করছিল যে আমরা মন্ত্র তন্ত্র ঝেড়ে ভূত তাড়িয়ে দিয়েছি। যাক্ মন্ত্র তন্ত্র ঝেড়েই হোক্ বা যেভাবেই হোক্ ভূত তো পালাল, এখন আমাদের উপর

ওদের ভক্তি দেখে কে! বোধ হয় সেকেলে লোকও তাদের গুরুদেবকে অত ভক্তি করত না। রাস্তায়, পথে, ঘাটে যেখানেই যার সাথে দেখা হক্ না কেন; একটা নমস্কার না করে আর ছাড়ে না। সে নমস্কারের বহরটা আবার একটু মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল। এইভাবেই দিন গুলি কেটে যাচ্ছিল বেশ।

—একদিন—

সকাল বেলায় লজিকের নোট্‌টায় একরকম চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম, এমন সময় দাদা এসে ঢুক্‌লেন আমার ঘরে। হঠাৎ আমার দাদাকে আমার ঘরে ঢুক্‌তে দেখে আমি একটু হতভম্বের মত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালুম। দাদা আমাকে বস্‌তে বলে তক্তাপোষের ওপরই বসে পড়্‌লেন।

"বিনয়! আজ ক্‌লেজ থেকে একটু শীগ্‌গির করে ফিরিস্। তোর কাছে আমার একটা কথা আছে। বিকেলবেলায় বোল্‌বো। এখন আর সে সব কথা বোল্‌বো না। কারণ এখন আমার অনেক কাজ। কলেজে যেতে হবে, সে সব কথা বল্‌তে গেলে অনেক সময় কেটে যাবে।" দাদা আমাকে এই কথাগুলো বলে চলে গেলেন।

দাদার কথামত আমি মেডিকেল কলেজ থেকে একটু শীগ্‌গির করেই বাড়ী [illegible]। বাড়ীতে ঢুকেই দেখি যে তিনি তাঁর ডিস্‌পেন্সারী রুমে একাকী বসে বসে কি যেন ভাব্‌ছেন। দাদাকে চিন্তিত দেখে আমার মনেও একটা ভাবনা হোল। আমি মনে মনে বল্‌লাম—"দাদাকেও কি তাহ'লে ভূতে পেয়েছে নাকি? না—তাই বা হবে কেন? যে দাদা আমাকে পাগল বলে আমার গল্পগুলিকে হেসে উড়িয়ে দিতেন, সেই দাদাকে কখনই ভূতে ধরে নি। হয়ত বা অন্য কোন ব্যাপার ট্যাপার হবে। যাক্ দেখা যাক্ শেষকালে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

আমি কোনও কথা বল্‌বার আগেই তিনি বল্‌তে আরম্ভ করলেন তার দীর্ঘ ভূমিকা—

"বিনয়! আমি যে কথাটি তোকে আজ বল্‌ব, তা'র বিন্দু বিসর্গও যেন কেউ না জানে।"

"সে আবার এমন কিঁ কথা হতে পারে যা আমি তোমার নিষেধ স্বত্বেও অন্য কাউকে বল্‌তে যাব।"

দাদা আবার বল্‌লেন—"যাক্ সে কথা, এখন কাজের কথাই হোক্,না। আসল কথাটিও যেন আমার গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তোকে বোল্‌বো বোল্‌বো বলেও যেন

আর বল্‌তে পারছি না। ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারছি না। কথাটি বলব কি না? একটা কাজ কর্। চট্‌পট্ করে জামাটা ছেড়ে নিয়ে হাত পা ধুয়ে, কিছু খাবার টাবার খেয়ে আবার এখানে আসিস্। দেখিস্ দেরী করিস্ না যেন।

আমি আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে উপরে উঠে গিয়েই জামাটা ছেড়ে ফেল্লাম। বউদি ততক্ষণে আমার জলখাবারের রেকাবীখানা নিয়ে এসে হাজির হলেন। চট্‌পট্ জলখাবারটা সেরে নিয়ে দাদাব কাছে গিয়ে বসলাম।

দাদা বললেন—"দেখ্ বিনয়! তুই আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও তোর সাহস আছে খুব। আব তুইই সেদিন আমাকে যে গল্পটি বল্‌ছিলি, আমি সেটাকে আস্ত গাঁজাখোবী বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, আজ আমাব চোখের সাম্‌নে সেই গল্পটির কথাই ভাস্‌ছে। এই ধরে নে তোর সেই ভূতেদের কথা।

জীবনে কোনও-দিন ভূত বিশ্বাস করিনি, ভূত বলে যে কোন জিনিষ আছে, দু'দিন আগে সে কথা আমি কল্পনায়ও আন্‌তে পারিনি। আজ আমার চোখের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে একটা ধাঁধা তৈয়েরী করেছে,

সেই বিষয়টীর কথাই তোকে বলব। তবে—

—এই কথা কয়টী বলে দাদা একটু জিরিয়ে নিলেন। পরে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন।

"পরশু দিন সকালবেলায় এখানে বসেছিলাম। হাসপাতালে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি, এমন সময় একটী লোক এসে হাজির হল। সেই লোকটা একটি রোগী দেখ্‌বার জন্যে আমাকে তাঁর অনুরোধ জানালে। এমনকি এটাও জানিয়ে দিলে যে রোগী খুব গরীব। এ সংসারে তার কেউ নেই, সে হচ্চে সেই গ্রামেরই লোক। তার কোন এক আত্মীয় আমার কাছে চিকিৎসা করে ভাল হয়ে গিয়েছিল। তাই সেই আত্মীয়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এখানে এসেছে। এ রোগীটা আমাকে বেশী কিছু দিতে পারবে না। আমি যদি দয়া করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করি, তবে হয়ত রোগী বেঁচে উঠ্‌তে পারে, যদি আমি সেই রোগীকে সারাতে পারি তবে হয়ত গ্রামের আরও দশজনে আমাকে ডাকবে। এই ভেবে আমিও রোগী দেখ্‌তে যাব বলে তাকে আশ্বাস দিলুম। হাসপাতালের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে তার সঙ্গে গেলুম সেই রোগী দেখ্‌তে। যে জায়গায় রোগী দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, সে জায়গাটা হাওড়া ষ্টেশন হতে প্রায় একশ'

মাইল হবে, সে গ্রামের নামটিও আবার সেই তোর "সোণার হাটি", যে গ্রামের নাম ভূতেরাই বলে দিয়েছিল। আমি যে রোগীটিকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, সেও একজন নামকরা ডাকাত। ৩।৪ বার জেলও খেটেছে। শেষবারে যখন জেলথেকে বের হয়, তার ৩।৪ দিন পর থেকেই বিছানায় শয্যাশায়ী। এমনকি আজ ৩।৪ বছর পর্য্যন্ত এই একই ভাবে বিছানায় পড়ে আছে, কিন্তু মরবার কোনই লক্ষণ নেই। প্যারালাইসিসে তা'র সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে আছে। উপযুক্তরূপ চিকিৎসা হলে হয়ত এতদিনে ভাল হয়ে যেত। যাক্ সে সকল কথা। এখন আসল কথাই ধরা যাক্ না। আমি তাকে ভাল করে পরীক্ষা করছি এমন সময় সে আমার পা জড়িয়ে ধরে হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে ফেল্লে। তার কান্নার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে না পেরে তাকে বল্‌লাম যে তোমার এ রোগ আমি সারিয়ে দেব এর জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। তোমার পয়সা কড়ি কিছুই লাগ্‌বে না। আমার কথা শুনে সে বোধ হয় অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

তাই সে আমায় চুপি চুপি যা বল্‌লে, সে কথা শুনে তোর সেই ভূতুড়ে গল্প মনে পড়ে গেল, আমি আর সেখানে অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। একে-

বারে ষ্টেশনের দিকে। এদিকে যে লোকটী আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে আর দেখ্‌লাম না। যদিও তাকে খোঁজ করার ফুরসুৎও আমার ছিল না। আমার মনে বাজ্‌ছিল মাত্র এই ক'টী কথা যে অ-নে-ক টাকা। টাকার পরিমাণ শুন্‌লে তুই তো কোন্ ছার, অনেক রাজারাও পৈ পৈ করে লুফে নেয়। ওর পূর্ব্ব পুরুষের আমলের কে যেন মূল্যবান অলঙ্কারাদি এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। ৭ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে দেখ্‌লে যে ওর লুকান ধন ঠিকই আছে, কেবল মাত্র ওর বাড়ীখানি ধূলিসাৎ হয়ে আছে। তাই মাথা গোঁজবার মত করে কোনও রকমে বাঁশের খুঁটী দিয়ে একখানি কুড়ে ঘর তৈরী করেছিল। তারপর সেই ধনরত্ন হ'তে একিছু খরচ করে নিজের চল্‌বার মত ব্যবস্থা করে নেবে ভেবে রাত্রেই বিছানায় শুতেই যে জ্বর হল, সেই জ্বরই এই চার বছর।

এতদিন পর্য্যন্ত এই টাকা পয়সার কথা ও কাউকে বলেও নি আর কেউ বিশ্বাসও করেনি যে ওর টাকা পয়সা লুকান আছে। কারণ ওর জেল হবার পর পুলিশেরা তখন বাড়ী ঘর দোর ভেঙ্গে চূরমার করে

দিয়েছিল, তখন নাকি তারা অনেক টাকা পয়সা পেয়েছিলো। গ্রামের লোক ত আর কেউ বাদ পড়েনি ওর টাকা পয়সা নিতে। কিন্তু এই অসুখের পর থেকে আর কেউ কাছে ঘেঁসেনি, একে ত পুলিশের ভয়, তার উপর এখন তো আর ওর কাছে টাকা পয়সা নেই, ওর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্ছিল। তাই দেখে ওকে বলে কয়ে আমি চলে এলাম।

ষ্টেশনে এসে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে ওর নামটাও জেনে নিলুম। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে ওর বিষয়ে অনেক কথা শুন্‌লুম। তিনি আমায় প্রথমেই জিজ্ঞেস কর্‌লেন আমার ভিজিটের কথা, আমি উপযুক্ত রূপে ভিজিট পেয়েছি কিনা। আমি এক মুস্কিলে পড়্‌লাম। কি বলব? যদি বলি যে ভিজিটের টাকা দেয়নি, তা'হলে হয়ত মনে করবে যে ডাকাতের বাড়ী যে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে, সেও ডাকাত। যাক্ শেষকালে একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাই বল্‌তে হল। এখন একটা কাজ করতে হবে আমাদের। যদি ডাকাত বেটার ধনরত্ন থাকে, তবে তা আমাদের হাত করতে হবে। তুই একাকী বসে ভেবে দেখ্‌বি যে কি উপায়ে এই ধনরত্ন হাত করা যায়?"

দাদার কথা শুনে আমি আর বিশ্বাস না করে পারলাম না। কারণ সেই ভূতের কথার সাথে এর সব কটা কথাই মিলে গেছে।

পরদিন কলেজ কামাই করে দাদার সাথে রওনা হলাম সেই ডাকতদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে আমরা দু' ভাই একত্রে একটা বাসে উঠে পড়লুম। বাসে উঠে আমরা কেহ কোন কথা বল্‌লাম না। যেন পরস্পরের সহিত কাহারও কোনও সম্পর্ক নেই। মিনিট ৫।৭ পরে যখন বাসখানি হাওড়ায় রেলওয়ে ব্রীজ পার হয়ে গেছে, সেই সময় আমার দৃষ্টি গেল আমাদের বাসেরই অপর একটী ভদ্রলোকের প্রতি। সেই ভদ্র-লোকটী একবার আমার দাদার দিকে আবার আমার দিকে নজর দিচ্ছিল। আমার যেন মনটা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। লোকটীকে দেখে মনে হ'ল হয়ত বা সি, আই, ডি, কি, আই, ডি হবে, আমাদের উদ্দেশ্য যদি এ টের পায় তাহ'লে ত' আমাদের সব কাজ পণ্ড করে দেবে। যাক্—চুপ করে রইলুম, দাদার সাথেও কোন কথা বলা দরকার মনে করলাম না। বাস থেকে যখন নাম্‌লাম তখন দেখ্‌লাম সেই লোকটীও আমাদের পিছন পিছন নেমে পড়ল। বাস্ থেকে নেমে দাদা টিকিট

ঘরের দিকে গেলেন। টিকিট ঘরে গিয়ে জান্‌লেন যে ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী। আমি দাদাকে চুপি চুপি বল্‌লাম—সেই ভদ্রলোকটীর কথা। দাদা ত' আমার কথা শুনে যেন একেবারে থ' হ'য়ে গেলেন।

"এই জন্যেই আমি বলেছি যে তুই আমার চেয়ে এসব বিষয়ে ওস্তাদ। তা না হলে তুই চট্‌ করে ধরে ফেল্‌লি কেমন করে? ওই ভদ্রলোকটীই সেদিনও বাসে আমার সাথেই গিয়েছিল। আমি যখন ষ্টেশন্‌ মাষ্টারের সাথে কথা বল্‌ছিলাম, ওই লোকটীও সেই যায়গায় ছিল। এইবার আমার মনে হয় যে ও বোধ হয় পুলিশেরই লোক। তা না হলে আজই বা আমাদের পিছন পিছন আস্‌বে কেন?"

দাদা আস্তে আস্তে এই কথাগুলি বল্‌লেন। আমি দাদাকে বল্‌লাম—"তুমি চুপ্‌ করে থাক, আমি ওকে ঘোল খাইয়ে তবে ছাড়ব, ও যদি পুলিশের লোকই হয় তবে ওকে বুঝিয়ে দেব যে কত ধানে কত চাল হয়। আমি তোমাকে যা বলি তুমি তাই কর। তুমি আমার কাছে টিকিটের টাকা দেও; আমিই টিকিট কিনে নিয়ে আসি। ষ্টেশনের নামটা তোমার জানা আছে তো?"

দাদার কাছ থেকে টিকিটের পয়সা নিয়ে আমিই গেলাম টিকিট কিন্‌তে। দাদা সেই যায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে সেই ভদ্রলোককে আর দেখতে পেলাম না। আমি টিকেট করে নিয়ে ফিরে এসে দেখি যে সেই ভদ্রলোকটী একটা সিগারেট হাতে করে অপর এক ভদ্রলোকের সাথে কি যেন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌ছে। এইবার আমার আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে ও লোকটী নিশ্চয়ই পুলিশের লোক।

ট্রেন প্লাটফর্ম্মে এসে লাগ্‌তেই আমরা দু ভাই গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। আরও অনেক লোক গাড়ীতে বস্‌ল, কিন্তু সি, আই, ডি বেচারীকে আর দেখ্‌লাম না। ট্রেন প্লাটফর্ম্ম ছেড়ে দেওয়ায় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দাদাকে বল্‌লাম "যাক্‌ বাঁচা গেল। টিক্‌টিকির হাত থেকে তো রেহাই পেলাম, এখন দেখা যাক্‌ কি হয়?"

একটা ষ্টেশন ছেড়ে অপর একটা ষ্টেশনে এসে পড়ল। এইবার গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম ষ্টেশনটীর দৃশ্য। বাইরে তাকাতেই আমার দৃষ্টি গেল একটী লোকের উপর। এই লোকটীই তো সেই লোক।

যাকে আমরা সি, আই, ডি বলে সন্দেহ করেছিলাম, সে সিগারেট হাতে করে কার সাথে ফিস্ ফিস্ করে কথা বল্‌ছিল। যাক্ আমি যে ওকে চিন্‌তে পেরেছি, এটা যেন ও টের না পায়—এইরূপ ভান করে রইলাম, লোকটা আমাদের গাড়ীতেই উঠে পড়ল। আমরা দু' ভাই যে বেঞ্চীতে বসেছিলাম ভদ্রলোক আমাদের একেবারে কাছের বেঞ্চিতেই বসে পড়ল। ভদ্রলোকের আপাদ মস্তক দেখে নিলাম। ভদ্রলোককে দেখ্‌লে মনে হয় যে তার বয়েস আন্দাজ ৩০ কি ৩২, দেহের গঠনও বেশ স্বাভাবিক। গায়ে একটি লংক্লথের পাঞ্জাবী, হাতে একটী রিষ্টওয়াচও আছে। ভদ্রলোক একটা খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে লাগ্‌লেন, আর চোখ্ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে এক একবার আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখ্‌ছেন! দাদাকে কিছু না বলে আমি ভদ্রলোকের সাথে আলাপ জুড়ে দিলাম। প্রথমেই কাগজটা দেখে বল্‌লাম "স্যার! আমাকে একটা sheet দিন না।" আমি সেই কাগজটার একটা sheet নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখ্‌ছিলাম। প্রথমেই আমি তাকে বল্‌লাম যে "আপনি কোন্ ষ্টেশনে নাম্‌বেন ?"

ভদ্রলোক—"এই পরের ষ্টেশনেই নাম্‌ব। আপনারা ?"

"আমরা নাম্‌ব কামারহাটী ষ্টেশনে, সেখানকার সাব্‌ইন্‌স্পেক্টার বাবুর বাড়ীতে অসুখ নাকি শুনেছিলুম। তাই আমার দাদাকে নিয়ে যাচ্চি দেখাতে।"

ভদ্রলোক যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেছেন। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল।

এদিকে আমার কথা শুনে দাদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি যে হঠাৎ একটা যা তা কথা বল্‌তে পারি তা দাদা ধারণা করতে পারেন নি। একটা প্রবাদ আছে যে "হঠাৎ বুদ্ধি"। যদিও আমি সেই হঠাৎ বুদ্ধিরই আশ্রয় নিয়েছিলুম। কামারহাটি ষ্টেশনের সাব্‌ইন্‌স্পেক্টারের নামটা আমার জানা ছিল, আমাদের কলেজেরই একটি ফ্রেণ্ডের দাদা। তার কাছে এটাও শুনেছি যে তাদের বাড়ীতে অসুখ। এখন এই টিক্‌টিকিকে দেখে আমার সেই কথাই মনে পড়ে গেল, তাই হঠাৎ বোল্‌ ছেড়ে দিলুম। এখন আবার আর এক মুস্কিল দাঁড়িয়ে গেল দাদাকে নিয়ে। দাদাকে যদি কোন প্রশ্ন করে বসে এবং দাদা যদি তার যা তা উত্তর দেয়, হলও তাই। ভদ্রলোকটী দাদাকেই প্রশ্ন করে বস্‌ল—

দাদা উত্তর করবার আগেই আমিই তার উত্তর দিলুম। দাদা তো একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। ভাগ্যে সে সাব্‌ইন্‌স্পেক্টারের নামটা আমার জানা ছিল, নইলে ও নিশ্চয়ই আমাদের সন্দেহ করত। ২।১ বার মনে হয় ও জানুকই না যে আমারা সেই ডাকাতের বাড়ী যাচ্ছি। আবার মনে হয় যে তাহলে ত' আর পেছু ছুট্‌তে কামাই করবে না।

একটা ষ্টেশনে ট্রেন থাম্‌তেই ভদ্রলোক নেমে পড়ল। আমিও তার পেছু পেছু গিয়ে এক খাবারওয়ালার কাছ থেকে কিছু খাবার কিন্‌লাম, যদিও এ কেনাটা একটা লোক দেখান ছিল, কারণ ও ভদ্রলোক কোথায় যায় তাই দেখা আমার উদ্দেশ্য। আমি আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লাম যে ভদ্রলোক বেশ নিশ্চিন্ত মনেই প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ষ্টেশন মাষ্টারের রুমে গেল। আমি একটু সরে দাঁড়িয়ে খাবার খেয়ে নিলুম। ওদিকে আমার চোখ ছিল সেই টিক্‌টিকির দিকে। দেখ্‌লাম যে, সে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়ে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ছে। এদিকে ট্রেনের হুইস্‌ল্ পড়্‌ল। আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লুম। গাড়ীতে উঠে দাদার কাছে সব কথা খুলে বল্‌তেই

দাদা শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যে ভদ্রলোকের সাথে কথা বল্‌ছিলাম সেই ভদ্রলোক যে সি, আই, ডি, এ বিষয়ে আর আমার কোনও সন্দেহই রইল না।

যে ষ্টেশনে আমাদের নামবার কথা সেই ষ্টেশনে না নেমে আমরা নাম্‌লুম তার আগের ষ্টেশনে। এদিকে পুলিশ মহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যেক ষ্টেশনেই পুলিশের পাহারা। পুলিশের লোক ভেবেছিল যে আমরা কোন ডাকাতি ফাকাতির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। তাই এত সব আয়োজন। আমরা প্লাটফর্ম্মে নেবে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ষ্টেশনেরই কাছে যে রেলওয়ে রেষ্টুরেণ্টটী আছে; সেই রেষ্টুরেণ্টে চা ইত্যাদি খেয়ে আমাদের কর্ত্তব্য ঠিক করে নেব ভেবে যাই সেই দোকানে বস্‌তে যাব, অমনি দেখ্‌তে পেলাম যে আবার এক ভদ্রলোক আমাদের পাশে এসে বসে পড়ল। দোকানদার অর্ডার নিতে এসে যেন একটু থম্‌কে দাঁড়াল। দোকানদারের ভাব দেখে মনে হল যে সে ওই লোকটাকে চেনে। কিন্তু ওর কাছে কিছু জিজ্ঞেস না করে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে— আমরাও চা, কেকের অর্ডার দিলুম। দাদা একটা

সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। টেবিলের ওপরই দেশলাই ছিল। আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যেই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্ সেই ভদ্রলোকটীও এক কাপ চা কে সাবাড় করে দিলেন। দাদার সঙ্গে আমার আর কোন কথাই হোল না। আমার মাথায় একটা খেয়াল চেপে বস্‌ল। আমি দাদাকে একটা ইসারা করতেই দাদা উঠে পড়লেন। আমি আর তার দিকে ফিরেও চাইলাম না। দাদা এবার একটা বুদ্ধির কাজ করেছিলেন, উঠে যাবার সময় দোকানদারকে তারই চায়ের দামটা দিয়ে গেলেন। আমার দামটা আর দিয়ে গেলেন না। ভাগ্যিস্ তখন পর্য্যন্তও আমার চা খাওয়াটা শেষ করিনি। আমি অন্যমনস্কভাবে চায়ের বাটী হাতে করে ষ্টেশনের চারদিককার দেওয়ালে টাঙ্গান প্লাকার্ডগুলি দেখ্‌ছিলাম।

এইভাবে বোধ হয় অনেকক্ষণ কাটাতাম যদি না দেখ্‌তাম যে ভদ্রলোকটী উঠে গিয়েছেন। ভদ্রলোকটী উঠে গেলে পর আমিও উঠে পড়লাম। কিন্তু দাদাকে না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ষ্টেশনের চারপাশে দাদাকে খুজে দেখলাম কিন্তু কোথায়ও মিল্‌ল না দেখে হাঁটা সুরু করে দিলাম। ষ্টেশনের ঠিক পাশ দিয়ে

যে রাস্তাটী ঠিক সোজাসুজি ভাবে পশ্চিমদিকে গিয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে হাট্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। কিছুদূর গিয়ে আবার আমাকে ফিরতে হ'ল। কারণ আমি একা— এভাবে একা হাট্‌লে কোথায় গিয়ে পৌঁছিব তা'র ত ঠিক ঠিকানা নেই। আমি ত' আর পথ ঘাট চিনি না, আর চিন্‌লেই বা কি হবে? আমাকেই বা সে ডাকাত চিন্‌বে কেমন করে? আমি ত' আর তার নাম ও জানি না। আর নাম জান্‌লেই বা সেখানে গিয়ে কি ফল হবে। মিছামিছি যাওয়া, এই না ভেবে আমি আবার সেই ষ্টেশনের দিকেই ফির্‌লাম। ষ্টেশনে ফিরেও দাদাকে দেখতে পেলাম না। মহা ভাবনায় পড়া গেল। পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম যে মাত্র একটাকা পাঁচআনা পয়সা আছে। সেই ষ্টেশন থেকে কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হলে আমার যাওয়াই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে।

সেখান থেকে কল্‌কাতা যাবার ট্রেণ ছাড়তে ত' অনেক দেরী। সে রাত আটটায় একটা গাড়ী আছে অবশ্য। রাত আট্‌টা অবধি বসে থাকাও যায় না। আর ততক্ষণ বসে থাক্‌লে ক্ষিধেও যে লেগে যাবে। নানারকম চিন্তা এসে আমার মনকে অধিকার করে বসেছে। প্লাট্‌ফর্ম্মে পায়চারী করছি—এমন সময় আমার পিছনদিক থেকে কে

যেন আমার নামধরে ডাক্‌তেই চেয়ে দেখি যে আমার একজন ক্লাশফ্রেণ্ড্‌। তাঁর নাম অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। সেও সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। তাদের বাড়ী ওই ষ্টেশনেরই কাছাকাছি। অজিতকে পেয়ে আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠ্‌ল।

তার সাথে গল্প করতে করতে একেবারে তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। সেদিন রাত্রে তাদের বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলুম। পরদিন ভোর বেলায় কল্‌কাতায় ফিরে এসে দেখি যে দাদা মাথায় হাতদিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারী রুমে বসে আছেন।

৩

কল্‌কাতার পুলিশ কমিশনার সাহেব কি একটা জটীল বিষয়ের মিমাংসার জন্যে পেন্সিলটী হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে কি যেন ভাব্‌ছিলেন এমন সময় একখানি টেলিগ্রাফ পেলেন।

হাওড়া জেলায়—কামারহাটীর পুলিশ অফিসার জানাচ্ছেন যে সেখানকার নামজাদা ডাকাত রামকুমার চক্রবর্ত্তী জেলথেকে খালাস পাওয়ার পর ৪ বছর বিছানায় শয্যাশায়ী. এতদিন তার বাড়ীতে কোন সাক্‌রেতই যাতায়াত করেনি। কয়েকদিন ধরে কল্‌কাতা থেকে এক ডাক্তার রোজ যাওয়া আসা করে। যে ডাক্তারটী এখানে আসে সেও বোধহয় কোন একটা বড় রকমের ডাকাতির মতলবে আছে। হয়ত বা কোনও কালে ওরই সাক্‌রেত ছিল। কয়েকজন সি, আই, ডি অফিসারের সাহায্য দরকার। কমিশনার সাহেব বেয়ারাকে ডেকে ললিত বাবুকে খবর পাঠাতে বল্লেন।

ললিত বাবু ছিলেন তখনকার আমলের নামকরা ডিটেক্‌টিভ। ললিত বাবুর নাম না জানত এমন লোক

কল্‌কাতা সহরে ছিল না বল্‌লেই চলে। ললিত বাবুর নাম অনেকেই জানে সত্য, কিন্তু তার চেহারা অনেকেই দেখেনি।

বেয়ারা কমিশনার সাহেবকে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতেই সাহেব বল্লে—"কেয়া..বাবুকো খবর দিয়া ?"

বেয়ারা—"হুজুর ! বাবু আভী ঘর চলা গিয়া।"

সাহেব ললিত বাবুকে ফোন্ করতেই পনের মিনিটের ভেতর তিনি এসে হাজির হলেন সরাসর সাহেবের কাছে।

সাহেব ললিত বাবুকে কামারহাটীর পুলিশ অফিসারের তার দেখালেন।

ললিতবাবু সেই তারখানি পড়ে দেখেই হেসে ফেল্লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, যদিও সাহেব সে কথার অর্থ তখন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। শেষকালে অবিশ্যি যখন ইংরাজীতে সাহেবের নিকট প্রকাশ কল্লেন, তখন সাহেবও না হেসে পারলেন না। এমন কি আমোদের উল্লাসে সাহেব তার পিঠ চাপ্‌ড়ে একটু আদর করে নিলেন।

ললিতবাবু বল্‌ছিলেন—

—"এর জন্যে আমাকে ডাকা কেন ? শেষকালে কি

মশা মার্‌তে কামান দাগাতে হবে?” এত একটা সামান্য ব্যাপার।

সাহেব—“বহুত আচ্ছা! তোমাকেই আমি এ ভার দিচ্ছি। কাল-থেকেই তোমার ওপর এ ভারটা রইল। রামকুমার ডাকাত ব্যাটার অসাধ্য কিছুই নেই। হয় ও ডাক্তারের সর্ব্বনাশ করবে। না হয় ওর দ্বারা কোন ডাকাতির মতলবে আছে।”

সাহেবের কথা শুনে ললিতবাবু একটু ভাবনায় পড়ে গেলেন। সোণারহাটীগ্রামের রামকুমার ডাকাতকে তিনি নিজের চোখে দেখেন নি কোনও দিন, কিন্তু ফাইলে তার রেকর্ড দেখেছেন। ১০।১৫ বছর আগেকার যত বড় বড় ডাকাতির রেকর্ড পাওয়া যায়, তার সব ক'টায়ই ও জড়িত ছিল।

সাহেবকে সেলাম জানিয়ে রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ীতে ফিরলেন।

শ্যামবাজার অঞ্চলের একখানি বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সি দাঁড়াতেই সেই বাড়ীর দারওয়ান এসে হাজির।

ললিতবাবু সেই দারওয়ানকে বল্‌লেন, বাড়ীর মালিককে খবর দিতে। বাড়ীর মালিক অর্থাৎ অমিয়

বাবু অমনি এসে হাজির। খালিগায়ে, স্যাণ্ডেল পায়ে ট্যাক্সির কাছে আস্‌তেই ললিতবাবু বল্‌লেন—

"ভাই অমিয়, একটা জরুরী কাজের জন্য আমায় একটু বাইরে যেতে হবে।

শীগ্‌গির করে জামাটা গায়ে দিয়ে বাড়ীতে বলে কয়ে আমার বাড়ীতে আসিস্, দেখিস্ যেন দেরী না হয়। হয়ত তোরও আমার সাথে বাইরে যেতে হতে পারে।"

ললিত বাবু অমিয়কে বলে বাড়ী ফিরলেন। ললিত বাবুর বাড়ী ছিল আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। কাজেই ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই বাড়ীতে পৌঁছে গেলেন।

ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠ্‌ছিলেন আর ভাবছিলেন যে কি করা যায়। এ কাজটার জন্যে আর মিছি মিছি সময় নষ্ট করে লাভ কি? এ কাজের জন্যে অমিয়কে ভার দেওয়াই ভাল।

এই সব সাত পাঁচ ভেবে তেতলায় তার নিজের রুমে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন, যে তখন পর্য্যন্তও দশটা বাজেনি। একবার খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বসে বসে ভাব্‌ছেন আর নিজের মনে মনেই

প্রশ্ন কর্‌ছিলেন। কিন্তু সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় কে? তিনি হচ্ছেন বাংলা দেশের নামজাদা ডিটেক্‌টিভ ললিত চাটুয্যে। তার সাথে চালাকীতে পেরে ওঠা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়। যাক্‌ আর বেশীক্ষণ ভাব্‌তে হল না। অমিয়বাবু ত' এসে পড়লেন। অমিয়কে একটা চেয়ার দিলেন বস্‌তে।

অমিয়বাবু চেয়ারে বস্‌তেই বস্‌তেই ললিতবাবু বল্‌তে আরম্ভ করলেন—"ভাই, একটা কাজের ভার দেব তোকে, পারবি? আমি তো আছিই। এই পড়ে দেখ্‌।"

এই বলে ললিতবাবু কামারহাটির পুলিশ অফিসারের টেলিগ্রামখানি দেখালেন।

টেলিগ্রামখানি পড়ে দেখে অমিয়বাবু একচোট হেসে নিলেন, পরে বল্‌তে আরম্ভ করলেন—"ভাই ললিত! তুই ত মনে খুব বড়াই করিস্ যে তুই খুব বড় ডিটেক্‌টিভ্। এ একটা সামান্য ব্যাপারের জন্যে তোর এত ভাবনা। তা'হলে শোন্ এর একটা ইতিহাস।

পরশুদিন আমি আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। হাওড়া ষ্টেশন থেকে বাসে উঠে কিছুদূর গিয়ে আবার ট্রেণে উঠে যেতে হয়। ফিরবার সময় ষ্টেশনে ট্রেণের জন্যে ওয়েট্ করতেই এক ভদ্রলোক ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে একটা গল্প করছিল, ভদ্রলোকটীর কথায় বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি একজন ডাক্তার। রামকুমার ডাকাতকে চিকিৎসা করবার জন্যেই তার যাতায়াত। তাকে দেখে আমার মনে হয় যে ও ডাকাতের সাক্‌রেত ফাক্‌রেত নয়। ডাক্তার বাবুটীকে দেখতে নেহাৎ সাদাসিধে ধরণের। আমি তার সঙ্গে কোনও আলাপ করি নি, তার উদ্দেশ্যটা একটু টের পেয়েছিলুম। ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট কথা বল্‌তেই আমি ধরে নিয়েছিলুম যে ওর ধারণা যে, ডাকাত ব্যাটার

অনেক ধনরত্ন আছে। এমনকি সে সব টাকা পয়সা বের করবার কোনই সাধ্য নেই। তবে ডাক্তারবাবুটী ভিজিট পেয়েছিলেন ঠিক ষোল আনাই। ষ্টেশন মাষ্টার-বাবুর কাছ থেকে জেনে নিলাম, যে ডাক্তারবাবুটী যদি বাস্তবিকই ভিজিট পেয়ে থাকেন তবে সে টাকা রামকুমার পেলে কোথায়? গাঁয়ের একটী কাক প্রাণী পর্য্যন্তও বাড়ীর কাছ দিয়েও হাটে না। যখন ওর তেজ বিক্রম ছিল, তখন গাঁয়ের লোক কেন, ভিন্ গাঁয়ের লোক পর্য্যন্তও রামকুমারের কাছ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য পেয়েছে। রামকুমার ত আর ছোট খাটো ডাকাতি করত না যে চুনোপুটীরা তাকে ভয় করবে। রাজা রাজরার বাড়ী ডাকাতি হ'লেই সে সব রামকুমারেরই কাজ।

ডাক্তারবাবুর কথায় বুঝ্তে পেরেছিলাম যে আজ আবার তিনি যাবেন রামকুমারকে দেখ্তে।"

ললিতবাবু অমিয়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আর তার কথা শুন্ছেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথাই বলেন নি, এইবার অমিয়বাবুকে বল্লেন—"ভাই এখনই তবে চল্ হাওড়া ষ্টেশনে। ডাক্তারবাবুকে একবার ফলো করা দরকার। তারপর

বোঝা যাবে যে তিনি কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন রামকুমারের বাড়ীতে।

* * *

অমিয়বাবু ও ললিতবাবু হাওড়া ষ্টেশনের পাশ দিয়ে পায়চারী কচ্ছেন, মাঝে মাঝে এক একটা সিগারেটকে সাবাড় কচ্ছেন। কিন্তু কেউ কারুর সাথে কথা বল্‌ছেন না। অমিয়বাবুর নজর ছিল হাওড়া ব্রীজের দিকে। ব্রীজের ওপর দিয়ে যে বাস আসে যায়, সেই বাসের ষ্টপেজের দিকেই তার নজর ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘণ্টাখানেক কাবার হয়ে গেল। বেলা যখন প্রায় বারটা তখন অমিয়বাবু দেখ্‌লেন যে সেই ডাক্তারবাবুই বাসে উঠ্‌ছেন। তার পিছন পিছন একটী ছোক্‌রাপানা লোককেও দেখ্‌তে পেলেন, ললিতবাবুকে ইসারায় জানিয়ে দিয়ে নিজে উঠে পড়লেন সেই বাসে। ললিত-বাবু পিছনের বাসে উঠে বস্‌লেন। তারপর যা যা ঘটেছিল তা এর আগেই বলা হয়েছে।

৮

পাঁচ সাতদিন সকলেই চুপচাপ। আমার সাথে দাদার আর কোন পরামর্শ হয় নি। একবার ফিরে এসে আবার চেষ্টা না করে চুপ্ চাপ্ বসে থাকা ভাল মনে করলাম না। তাই দাদাকে বল্লাম—"দাদা, আর একবার গেলে হয় না।"

দাদা আমাকে বল্লেন—"আমি এর ভেতরে একদিন গিয়েছিলুম, রামকুমারের অবস্থা এখন একটু ভাল, উপযুক্ত ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আর সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। শেষকালে পুলিশের হাতে পড়ে চাকরীটুকুকেও খোয়াব, এটা ভাল মনে করি না। যাক্ তোকে নিয়ে একবার ওর সাথে পরিচয় করে দিয়ে আসতে পারলে শেষে তুই একবার চেষ্টা করে দেখতিস্।"

দাদার কথা শুনে বুঝ্লাম যে তার দ্বারা ধনরত্ন উদ্ধার করা যাবে না। আর টাকা পয়সা আছে না আছে, তারও ত' কোন ঠিক ঠিকানা নেই। দাদার সাথে আর বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হোল না। আমি আমার কাজেই মন দিলুম।

সেদিন ছিল শনিবার। মাত্র এক ঘণ্টা ক্লাশ। কলেজে গিয়ে সেই অজিতকে খুঁজে নিলুম। অজিতের সাথে দেখা হতেই সে আমায় তাদের বাড়ী যেতে অনুরোধ জানালে। পরদিন রবিবার আমার যাওয়ার কথা [illegible] বাড়ীতে। সকালবেলায় চা খেয়েই বেড়িয়ে পড়্‌লাম অজিতদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

বেশ নিরাপদেই তাদের বাড়ী পৌঁছিলাম। সেদিনটা আমার বেশ কাট্‌ল। কোনওরূপ দুশ্চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নি। কারণ হাওড়া ষ্টেশন থেকে সেই অজিতদের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পথে কোন টিক্‌টিকির সাথেই দেখা হয় নি। হয়ত বা ছিল, আমার নজরে পড়ে নি। যদি কোন টিক্‌টিকি আমার পেছনে লেগেই থাকে তা হলেও তাকে হার মান্‌তে হয়েছে। কারণ অজিতের বাবা ছিলেন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কোথায় আমি যাব ডাকাতের বাড়ী, আর আমি কিনা যাচ্ছি একজন সরকারী কর্ম্মচারীর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে। আর ওরাই বা আমাকে কেমন করে বুঝ্‌বে। ওরা চলে ডালে ডালে আর আমি চলি পাতায় পাতায়। আমার উদ্দেশ্য বোঝা ওদের সাধ্যের অতীত। অজিতদের বাড়ীতে খেতে বসে কত রকমের ভাবনাই ভাব্‌ছি।

আর মনে মনে বল্‌ছি যে "ললিত চাটুয্যে! শুনেছি যে তুমিই আজকাল বাংলায় শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ্‌, আজ তার পরীক্ষা করব। রামকুমারের সঞ্চিত টাকা আমিই উদ্ধার করব। এতে যদি তুমি বাধা দিতে আস তবে তোমার একদিন আর আমারও একদিন। আমার মত একটা নগণ্য যুবকের হাতেই তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।"

খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে একটু বিশ্রাম করব বলে বারান্দায় একটা তক্তপোষের ওপর আমার দেহখানাকে এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় আমার কানে এসে ধাক্কা মার্‌ল একটা অস্পষ্ট শব্দ। তখন বেলা প্রায় একটা হবে। আমার মনে হল যে পাশের ঘরে দু'জন লোকে কি যেন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌ছে। আমি দেওয়ালে কান পেতে শুন্‌লাম কে যেন বল্‌ছে "এই ছেলেটা কিন্তু সাধারণ পাত্র নয়, এ একটা কুমত্‌লবে এখানে এসেছে, একে নজর রাখবেন। আমি ষ্টেশনে লোক রেখে এসেছি একে নজর দেবার জন্যে। এ কোন্‌দিকে যায় সেইটাই শুধু আমাকে জানাবেন।"

এই কয়টা কথাই মাত্র শুন্‌লাম আর কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমায় আর বুঝতে বাকী রইল না যে দেওয়ালের গায়েও টিকটিকি থাকে।

এই ডিটেকটিভ্ পুলিশের অসাধ্য কাজ থাক্‌তে পারে এমন কাজ বোধ হয় জগতে নেই। এদের ফাঁকি দিয়ে যে কোন কাজ করা যাবে এমন মনে হয় না। যাক্ চুপ করে থাকাই উচিত মনে করে ঘুমের ভাণ করে পড়ে রইলুম। আমাকে দেখ্‌লে অপরে মনে করবে যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিন্তু আমি নিদ্রিত থেকেই জাগ্রত। আমার কান রয়েছে দেওয়ালের প্রত্যেক ইটের ফাঁকে ফাঁকে।

দশ পনের মিনিট এইরূপে পড়ে থাকায় আমার মনে হল যে দু'জন বাড়ীর ভেতর হ'তে বারান্দায় এসে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি একবারের জন্যে চোখ মেল্‌লাম। চোখ মেলে চেয়ে দেখি অজিতের বাবা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে বাড়ীর বাইরে সদর রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছেন। যে ভদ্র-লোকের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন, সেই ভদ্রলোকের চেহারাখানা একবার দেখে নিলেম। সেদিন ট্রেণের মধ্যে যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে খবরের কাগজ চেয়ে নিয়েছিলুম, এ লোকটাত' সে-ই। আমি মনে মনে বল্‌লাম—'তবে ইনিই যদি ললিত চাটুয্যে হয় তবে একে একবার দেখে নেব ভাল করে। একবার পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে যাবে।

আর ঘুমান সঙ্গত মনে না করে অজিতকে ডেকে তাস খেলবার প্রস্তাব করলাম। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তবে হয়ত মতলব ঠিক করতে পারব না, তাই ভেবে তাস খেলানোটাকেই উচিত মনে করলাম। অজিতদের বাড়ী আর রামকুমার ডাকাতের বাড়ী ৩।৪ মাইলের তফাৎ।

সন্ধ্যে হওয়ার কিছু আগে অজিতকে সঙ্গে করেই তাদের বাড়ী থেকে বের হ'লাম। রাত ৮ টায় একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে কল্‌কাতায় ফিরব।

ষ্টেশনে বসে অনেক গল্প গুজবে সময়টা কেটে গেল, দু' বন্ধুতে কত কথাই না' হ'ল। যদিও সে সকল কথার ভেতরে কোনই মৌলিকত্ব ছিলো না। সব সময়ই আমার মনে হতে লাগ্‌ল সেই একই কথা! টাকা, টাকা, টাকা, রামকুমারের সঞ্চিত অর্থ আমাকে পেতে হবেই, এতে আমার যত রকমের বিপদকে বরণ করতে হোক্ না। আমি কোরবই।

যাক্ ট্রেন প্লাটফর্ম্মে লাগ্‌তেই আমি উঠে পড়লুম। গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

বাসায় ফিরে দেখি যে দাদা কোথায়ও রোগী দেখ্‌তে গেছেন।

প্রায় ৩।৪ দিন কেটে গেল কোনই সুযোগ করে

উঠ্‌তে পারলুম না। এই ভাবে একটা আশা নিয়েই বা কতদিন থাকা যায় ?

একদিন সকালবেলায় দাদা ডিস্‌পেন্সারী ঘরে বসে আছেন, হাসপাতালে যাবার যোগাড় করছিলেন, এমন সময় একটী লোক এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। আমি তখন দাদার সাথে সাংসারিক কথা বল্‌ছিলাম, দাদা চিঠিখানি একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে আমার হাতে দিলেন।

চিঠিখানি আগাগোড়া পড়ে দেখে দাদাকে সেইদিনই একবার যেতে বল্‌লাম সোণারহাটী। রামকুমার নিজে দাদাকে যেতে অনুরোধ করে লিখেছে।

দাদা সেইদিনই দুপুরবেলায় সোণারহাটী গেলেন। সারাদিন ধরেই আমার মনে কেবল এই একই চিন্তা যে দাদা আবার কোন ফ্যাসাদে না পড়েন। আর ফ্যাসাদে পড়লেনই বা। তাকে তো আর কেউ আটকাতে পারে না। কারণ তিনি তো ডাক্তার, তা ছাড়া তিনিও তো গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী। তার তো সব যায়গাতেই যাওয়া চলে। আমারই বিপদ। আমি যে কলেজের ছোক্‌রা। আমার সাথে একটা ডাকাতের সাথে ঘনিষ্ঠতা কেন ?

দাদা রাত্রে ফিরে এসে আমাকে বল্লেন যে "রামকুমারের অবস্থা আগের চেয়ে অনেকটা ভাল।

২।৩ দিন পরে একবার দু'ভাইয়ে যাওয়া ঠিক করে ফেল্‌লাম। দাদা আগে যাবেন। এবং তিনি গিয়ে কামারহাটী ষ্টেশনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি পরের ট্রেণে গিয়ে তার সাথে দেখা করব, পরে একসঙ্গে রামকুমারের বাড়ী গেলেই হবে। যদি কোন ডিটেক্‌টিভ্‌ আমাদের পিছু পিছু যায়, তা হ'লে গেলই বা, তাতে আমাদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কারণ আমি যাচ্ছি রামকুমারের সঙ্গে একবার দেখা করতে। দাদা যদি আমাকে একবার পরিচয় করিয়ে দেন, তবেই আমি সুযোগমত আমার কাজ গুছিয়ে নেব।

পরামর্শমত কাজ করা হ'ল। দাদা ষ্টেশনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমি সেখানে যেতেই দাদা রেল লাইনের পাশের রাস্তা ধরে বরাবর পশ্চিম-দিকে হাটা সুরু করে দিলেন। আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে তার পিছু পিছু হাট্‌তে আরম্ভ করলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাটার পর দেখ্‌লাম যে দাদা একটু থমকে দাড়ালেন।

দাদা বরাবর কোট্‌প্যাণ্ট্‌ পরেই যেতেন, সেদিন

কাপড় জামা পরেই গিয়েছিলেন, পাড়াগাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ত' আর বেশী লোক হরদম্ যাওয়া আসা করে না। তার ওপর আবার ভাল জামা কাপড় পরে লোক হাটা চলা করে খুব কম। মাঝে মাঝে ২।১ জন লোক দেখা যায়। সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ের অবস্থাপন্ন লোক সহরেই থাকে। গরীব চাষাভূষাই পাড়াগাঁয়ে সব সময় বসবাস করে। দাদার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে একখানি ছড়ি, বাম হাতের কব্জিতে আবার একটা দামী রিষ্টওয়াচ্ বেশ শোভা পাচ্ছিল।

আমি দাদার চেয়ে প্রায় একশ' হাত পিছনে হাঁট-ছিলাম, আমার সাথে যে দাদার সাথে কোনও রকম সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

দাদাকে দাঁড়াতে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখ্লাম যে আমাদের কেউ অনুসরণ করছে কিনা?, কিন্তু কোথায়ও কোন লোকজনকে না দেখে একেবারে দাদার পিছনে এসে দাঁড়াতেই তিনি আমায় ইসারা করলেন। এবং বামদিকের সরু রাস্তা ধরে চল্তে আরম্ভ করলেন।

বামদিকের রাস্তাটী আবার গ্রাম্য রাস্তা। একজনের বেশী দু'জন লোক পাশাপাশি চলা কষ্টকর।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই একখানি বাড়ীর সাম্নে এসে দাঁড়ালাম। বাড়ীখানিতে মাত্র ১ খানি কুঁড়ে ঘর। কোনও কালে আরও ২।৩ খানি ঘর ছিল। তার ভিটি এখনও পড়ে রয়েছে। তাতে প্রায় একহাত উঁচু পরিমাণ আগাছার গাছ জন্মেছে। বাড়ীর দরজায় একটা পুকুর। আর তিন পাশেই জঙ্গল। সেই বাড়ীর উঠানে বসে খুব জোরে চীৎকার পাড়লেও বোধহয় কোন বাড়ী হ'তে শোনা যায় না। এই বাড়ীখানি প্রায় ৯।১০ বছর খালি পড়ে ছিল। তাই এর এত দুর্দ্দশা। তার উপর আবার ৪।৫ বছর পর্য্যন্ত বাড়ীর মালিক বিছানায় শয্যাশায়ী।

আমরা দু'ভাই বাড়ীর ভেতর ঢুকতেই একটা ১৪।১৫ বছরের বালক আমাদের আদর করে বস্‌তে দিলে।

আমি বারান্দায় বসে পড়লাম। দাদা ঘরের ভেতর রোগীকে দেখ্‌তে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে দাদা আমাকে রোগীর সাথে পরিচয় করে দিলেন।

বাড়ীতে ঢুকে অবধি আমার যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছিল।

দাদা রামকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতেই আমায় বল্লে—"পারবে? ছোক্‌রা! পুলিশের

চোখে ধুলো দিয়ে আমায় লুকানো ধনরত্নগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারবে? সে প্রায় ৪ হাত মাটীর নীচে। তা ছাড়া একটা গাছের গোড়ায়। বোধকরি এখন তার ওপর অনেক শেকড় গজিয়েছে। যদিও এখানথেকে বেশী দূরে নয়। তথাপি যদি কোন লোক টের পায়, তা হলে তোমাকে আর ছেড়ে দেবে না। একেবারে শ্রীঘরে পাঠাবে।" এই কয়টী কথা বলে আর কিছুই বল্‌তে পারলে না রামকুমার। তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হচ্ছে না দেখে আমার যেন মনটায় নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। কোথায়ও কোন লোক লুকিয়ে রয়েছে কিনা। কিন্তু তখন ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে দেখাও মুস্কিল। একবার সঠিক যায়গাটা বল্‌লে হয়ত চেষ্টা করে দেখ্‌তাম। দাদার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম যে তার মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর উদগ্রীব হয়ে ওরদিকেই চেয়ে আছে। রামকুমার একটা ইসারা করতেই আমি দাদার কানে কানে বলে দিলাম সেই ছোক্‌রাকে বিদায় করতে। যে ছোক্‌রা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে একটা ছুতো করে সেখান থেকে পাঠিয়ে দিলেম।

ছোক্‌রা সেখানথেকে চলে গেলে রামকুমার আমাকে

ও দাদাকে বলে দিলো সঠিক যায়গাটার কথা। তাদের বাড়ীর ঠিক পেছনে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। সেই কাঁঠাল গাছটার গোড়ায় মাটীর প্রায় ৪ হাত নীচে একটা বড় হাঁড়ির ভেতরে অনেক সোণার অলঙ্কার আছে। তার একটা অলঙ্কারের যা দাম তাতে আমাদের মত দরিদ্রের সংসারের আজীবন চলে যেতে পারে।

রামকুমারের কাছথেকে যায়গাটার সন্ধান নিলাম কিন্তু সে যায়গায় আছে কিনা তাই বা কে জানে? আমরা আর বেশীক্ষণ বসে থাকা নিরাপদ মনে না করে সে বাড়ী থেকে রওয়ানা হলেম।

ফিরবার সময় কাঁঠাল গাছটা একবার দেখে নিলেম। সে বাড়ীতে ঐ একটা মাত্র কাঁঠালগাছ তার চারপাশে আর কোন কাঁটাল গাছ নেই। কাজেই আমাদের আর বেশী বেগ পেতে হবে না।

রেল লাইনের রাস্তায় এসে পড়বার মধ্যে আর কোন লোকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু প্রায় হাত পঞ্চাশেক পথ হাটবার পর হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি যে আমাদের পিছন পিছন এক ভদ্রলোক আস্‌ছেন। সে ভদ্রলোককে সি, আই, ডি সন্দেহ করে আমরা দু'ভাই পথ চল্‌তে আরম্ভ করলাম।

ষ্টেশনে এসে পৌঁছে পিছন ফিরে আর সে লোকটাকে দেখ্তে পেলাম না।

মনে ভাব্লাম যে হয়ত বা এ ভদ্রলোক এই গাঁয়েরই লোক, রাস্তার পাশের গাঁয়ের রাস্তা ধরে চলে গেছে। যাক্ ব্যাটা যাক্‌গে, তাতে আমাদের কি? এই না ভেবে প্লাটফর্ম্মের রেষ্টুরেণ্টে চা খেতে বস্তেই আর এক ভদ্রলোকের প্রতি আমাদের নজর পড়ল। সে ভদ্রলোক টিকিট ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, টিকিট কিন্‌বার অপেক্ষায় বোধহয়।

এই ভদ্রলোকটীকেই সেদিন অজিতদের বাড়ীতে দেখেছিলুম।

দাদাকে ইসারায় জানিয়ে দিলুম যে এই লোকটীই সি, আই, ডি। আমাদের পিছু লেগেছে।

আমরা চা—টা খেয়ে খানিকক্ষণ ট্রেণের জন্যে প্লাটফর্ম্মেই পায়চায়ী করলাম। কারোরই মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। দাদা হয়ত নিশ্চিন্ত মনেই ছিলেন, আমি কিন্তু মনে মনে একটা মতলব ঠিক করে ফেল্‌লাম।

সেদিন কল্‌কাতায় ফিরে হাওড়া ষ্টেশণ থেকে আমি আর বাসায় না গিয়ে সরাসর হ্যারিসন রোডের একটা মেসে গিয়ে উঠ্লুম।

৫

কল্‌কাতায় মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ফেভারিট্‌ কেবিনে বসে ললিতবাবু চা পান কর্‌ছিলেন, আর রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তার অগনীত লোকের মাঝে একটী লোককে বেছে নেওয়া এটা একটা যে সে ব্যাপার নয়, তবুও তিনি যে ভার নিয়েছেন তার যে কিছুই কুল কিনারা করতে পারলেন না। সে যাক্‌গে এখন অমিয় এসে পড়্‌লে তবুও একটা হাফ ছেড়ে বাঁচেন। তার ওপর যে ভার দিয়েছেন, তারও তো সে কিছু করতে পারলেন না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ললিত বাবুর মনটাও ক্রমেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। তিনি আর বসে থাক্‌তে পারছেন না। কিন্তু উঠি উঠি করেও উঠ্‌তে পার্‌ছেন না। একবার ভাব্‌ছেন যে উঠে পড়া যাক্‌, না হয় রাস্তায়ই পায়চারী করবেন। আবার ভাব্‌ছেন যে চায়ের দোকানেই খানিকক্ষণ বসা যাক্‌।

এমন সময় আবির্ভাব হল অমিয় বাবুর। অমিয়বাবু হাস্‌তে হাস্‌তেই দোকানে ঢুক্‌লেন। এদিকে ললিতবাবু যে তার জন্যেই বসে আছেন, সেদিকে তার খেয়ালই নেই।

"অমিয়বাবু! ভাল আছেন তো?"

দোকানে একপাশ থেকে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন কর্‌লেন।

ললিতবাবু মহা মুস্কিলে পড়্‌লেন। "এ ব্যাটা আবার কোত্থেকে এসে জুটুল। খবরটা জিজ্ঞেস্ করতেও যে দিলে না।"

ললিতবাবু চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। সাম্‌নেই পানের দোকান থেকে এক খিলি পান মুখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন।

এর মধ্যে অমিয়ও চা পানটা শেষ করে তার সাথী হলেন।

দু'জনে কথা বল্‌তে বল্‌তে গোলদীঘীতে ঢু'কে পড়্‌লেন।

"দূর ছাই—একটা বেঞ্চীও যে খালি নেই। যাক্ দূর্ব্বাবনেই বসে পড়া যাক্।" এইবলে দুজনে দূর্ব্বার ওপরই বসে পড়লেন।

প্রথমে অমিয়বাবু তার বক্তব্য আরম্ভ করলেন। পকেট থেকে নোটবুকখানা বের করে দেখিয়ে দিলেন সেই ডাক্তারের নাম, ঠিকানা।

তারপর ললিতবাবু তার নোটবুকে টুকে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন। দু'জনে আর বেশী কথা হ'ল না।

"রাত ৯টার সময় আমার বাড়ীতে দেখা করিস্।" এই বলে ললিতবাবু অমিয়কে বিদায় দিলেন।

হ্যারিসন রোডের একটা মেসে সীট ঠিক করেই চটপট্ বাসা থেকে বিছানা পত্র আনলাম।

দাদাকে বলে গেলাম যে "আমার ঠিকানাটা কাউকে না দিতে। যদি কোনও সময় কেউ আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস্ করে, তা'হলে যাতে বলে দেয় যে আমি কল্‌কাতায় নেই।

রোজ ভোরবেলায় মেস্‌থেকে বেরিয়ে যাই আর রাত দশটায় মেসে ফিরি। এইরূপে ৫।৭ দিন কাটালাম। কোনও দিন দক্ষিণেশ্বর, কোনও দিন কালিঘাট, কোনও দিন টালিগঞ্জ, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লাম।

নিজেকে গা ঢাকা দিয়েই ৫।৭ দিন কেটে গেল। দাদার কাছথেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়েছিলুম যাতে করে অন্ততঃ মাসখানেক বেশ কেটে যাবে।

এই ভাবে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল বেশ। যদি কেউ টের পায় যে আমি কল্‌কাতায়ই আছি, তাহলে হয়ত

আমার পিছুপিছু ছুট্‌বে। আর যদি কেউ টের না পায় তা'হলে আর আমার পাত্তা পায় কে ?

একদিন ধর্ম্মতলার মোড়ে রমেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বহুদিন পর তার সাথে দেখা হওয়ায় তাকে আর ছেড়ে দিলাম না। তাকে সঙ্গে করেই ইডেন গার্ডেনের দিকে গেলাম।

তখন বেলা প্রায় দু'টা বাজে। কাজেই দুপুর বেলায় ইডেন গার্ডেনে লোকজনের ভীড় একটু কম।

রমেশের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলাম। রমেশকে একাকী পেয়ে বলে ফেল্‌লাম আমার উদ্দেশ্যটা।

"আচ্ছা ভাই, তোমার সাথে বহুদিন দেখা না হওয়ায় প্রাণটা যেন খালি খালি ঠেক্‌ছিল। আজ হঠাৎ দেখা হওয়ায় একটা আনন্দ যা হয়েছে, তা আর কি বল্‌ব। সে যাক্ এখন এই রকম এ্যাড্‌ভেঞ্চারের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া এটা বেশ ভাল কাজ। তবে কবে যাবে ঠিক করলে ?"

পরদিন দুপুরবেলায় ইডেন গার্ডেনে দেখা করতে বলে আমি চলে গেলাম সেখান থেকে খিদিরপুরের দিকে।

খিদিরপুরে আমার একটা মুসলমান বন্ধুর কাছে

থেকে একখানি ছোড়া ও একটা ছয়ঘড়ার রিভলভার সংগ্রহ করে নিলুম।

সেদিন মেসে ফিরে আর আমার ঘুম হল না। একে ত দুটো অস্ত্রই আমার হেফাজতে। তা তো বে-আইনী। যদিও আমি ত আর কাউকে মার ধোর করতে যাচ্ছি না। মনে মনে কতোই না বাঁড় বাঁড় করে বল্‌ছিলাম, তার কোনটার সাথে কোনটারই সম্পর্ক ছিলো না।

* * *

পরদিন রাত ভোর হতে না হতেই জানালা দিয়ে সদর রাস্তার দিকে মুখ বাড়াতেই যা দেখ্‌লাম তাতে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

—আমি যে ঘরটীতে থাক্‌তাম, সে ঘরটীতে আর অন্য কোন মেম্বরই ছিলো না।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লাম যে আমাদের বাড়ীর সদর দরজার সাম্নে প্রায় ১০।১২ জন পুলিশ যেন নবমী পূজার বলির পাঠার মত ঝিমোচ্ছে। আর দুজন পুলিশ আফিসার গেটের শিকল ধরে ভোরের অপেক্ষা করছে।

আমি আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে বিছানা হতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। চট্‌পট্‌ জামাটী গায়ে দিয়ে

সুটকেশের ভেতর থেকে টাকা ও রিভলভারটা পকেটে পুরে বেড়িয়ে পড়লুম। ছোড়াখানিকে কোমরের সাথে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আমার ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলুম। আস্তে আস্তে পা টিপে ছাদের উপর উঠে পড়লুম।

তখন পর্য্যন্তও আমাদের মেসের কোনও লোক ঘুম থেকে জাগেনি। কাজেই তখন আমি বার হয়ে গেলে আমাকে কেউ দেখতে পাবে না।

ছাদের উপরে গঙ্গার কলের যে ট্যাঙ্ক আছে। সেই ট্যাঙ্কের সঙ্গে একটা পাইপ বরাবর নীচের তলায় আমাদের মেসের পিছনে একটা সরু গলির মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

পাইপ বেয়ে নীচে নেমে পড়লাম। কিন্তু সদর রাস্তায় বের হলে ত পুলিশে ধরে ফেলবে। কাজেই মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম।

এখন কি উপায়ে পালান যায় তাই ভেবে ঠিক করতে পারলুম না।

এমন সময় আমার নজরে পড়ল যে আমার ডানদিক দিয়ে আর একটা সরু রাস্তা বেড়িয়ে গেছে। আমি সেই রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হাট্‌তে লাগ্‌লাম। এদিকে

ভোর হতে তখন আর বেশী দেরী নেই দেখে আমি সদর রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লাম।

সদর রাস্তায় এসে দেখি যে তখন বাস চলাচল আরম্ভ হয়েছে। একটা বাসে উঠে পড়লাম, সে বাসটা আমাদের মেসের একেবারে কাছ দিয়েই চল্লো।

বাসের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লাম যে পুলিশ মেসের বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। মাত্র ৪।৫ জন পুলিশ বাইরে পাহারা দিচ্ছে। মেসের সবলোকেই তখন জেগে পড়েছে বলে মনে হোল।

আমি মনে মনে একটু হেসে নিলুম। আমার সে হাসির অর্থ বোধ হয় ওরা মনে মনে টের পেয়েছিলো।

পুলিশের হাত থেকে একবার রেহাই পেলাম বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার যে আবার রেহাই পাব এমন মনে হয় না, কারণ আমি একা।

আমার সহায় মাত্র এক ভগবান। এ সংসারে আর কেউ নয়।

রমেশকে দুপুরবেলায় ইডেন গার্ডেনে দেখা করবার কথা বলেছিলেম। কিন্তু তাকে ত আর আমার মেসের ঠিকানাটা বলিনি, তবে পুলিশ আফিসে আমার ঠিকানা টের পেলে কেমন করে?

যাক্ আমি তো ভয়ে ভয়ে সরে পড়েছি। যদি ওরা আমাকে না খুঁজে অন্য কাউকে ধরে নিয়ে যায় তবেই বেশ হয়।

সকালবেলা থেকে নানা জায়গা ঘুরে বেড়িয়ে দুপুর বেলায় কার্জ্জন পার্কে বসে আছি, ইডেন গার্ডেনে যাব যাব মনে করছি। কিন্তু আমার চোখ চারদিকেই ঘুরছিল। কোথা হতে আবার কে আমাকে দেখে ফেলে। ট্রাম ডিপোর দিকে চোখ পড়তেই দেখি যে একজন লোক খুব তাড়াতাড়ি ছুটে আস্ছে ঠিক আমারই দিকে।

আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে পিছন দিকে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। পিছন ফিরে দেখবার আর অবসর কোথায় ?

একটা ট্যাক্সির উপর উঠে বস্তেই দেখলাম যে সেই ভদ্রলোক ছুট্তে ছুট্তে আস্ছেন। আমি চল্লাম খিদিরপুরের দিকে। কিছু দূর গিয়েই ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদেয় করে দিয়ে আবার পিছন ফিরে হাঁটা সুরু করে দিলেম। এইবার আর একটা ট্যাক্সিতে চড়ে ইডেন গার্ডেনেই পৌঁছলাম।

যদি রমেশ আসে তা হ'লে তার সাথে একটা পরামর্শ করে কাজ করা যাবে।

একটা নির্জ্জন জায়গা দেখে বসে পড়লুম। বেলা ত প্রায় দু'টা বাজে। এইবার রমেশ এসে পড়বে ভেবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখ্‌ছি এমন সময় দেখছি যে আমার দাদা আমার দিকেই আস্‌ছেন।

দাদা আমার খোঁজ পেলেন কেমন করে? যাক্‌ দেখা যাক্‌ তো ওদিককার খবরই বা কি? দাদা বল্‌লেন —"সকাল হতেই তোকে খুজছি, কোথায়ও তোকে না পেয়ে এখানেই পাব আশায় খুজতে এসেছি।

তোর মেসে গিয়ে প্রথমটায় ত মুস্কিলে পড়ে গেলাম। না পারি ভেতরে ঢুক্‌তে, না পারি কারও কাছ থেকে তোর খবরটা পেতে। দরজায় পুলিশ, ভিতরে পুলিশ। একটা যেন তাণ্ডবলীলা কর্‌তে সুরু করে দিয়েছে।

শেষে সেখান থেকে কোন খবরই পেলেম না। তবে তুই যে মেসে নেই একথা শুনেই ছু'টে চল্‌ছিলাম বাড়ীর দিকে, এমন সময় রমেশের সাথে দেখা হওয়ায় তার কাছে খবর পেলুম যে তুই দুপুর বেলায় এখানেই থাক্‌বি। তাই এখানে ছুটে এসেছি। এখন কি করা যায়!" দাদাকে সব কথাই গোপন রেখে মাত্র সামান্য কয়েকটা কথা বলে বিদায় দিলেম।

দাদার কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিলুম।

দাদা চলে যাওয়ার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, রমেশের দেখা নেই।

রমেশের জন্যে আমার মনটা কেমন যেন উতলা হয়ে উঠ্ছিল। এদিক ওদিক খুঁজে দেখ্তে লাগলুম যে রমেশ আমার জন্যেই কোথায়ও বসে আছে কিনা?

বেলা যখন ৪টা বাজে তখন রমেশের সাথে দেখা হ'ল।

রমেশ আস্তেই তার কাছে সব কথা খুলে বল্লুম। সে যাবার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল।

এখন তুই বন্ধুতে একত্র হয়ে রওয়ানা হলুম। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ছুটে মাঝখানে ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় দিলুম। খানিকটা দূরে গিয়ে আবার আর একটা ট্যাক্সিতে উঠে একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। ষ্টেশনে পেঁাছে প্লাট্‌ফর্ম্মের ভিতরে খানিকটা সময় পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে ভাব্‌ছিলেম যে এখন কি করা যায়? বাসে উঠে গেলে শেষকালে হয়ত আমাদের পুলিশে ধরে ফেল্‌বে। সকালবেলায় পুলিশের লোক আমাকে মেসে না পেয়ে হয়ত আমার খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার চোখটা ছিল চারদিক্‌কার মানুষের দিকে।

হঠাৎ রমেশ আমাকে ইসারা করতেই আমরা দুজনেই সেখান থেকে সরে পড়লুম।

চট্ করে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লুম।

ট্যাক্সিতে উঠে একেবারে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বরাবর শ্রীরামপুর গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় দিলুম।

এইবার প্লাটফর্ম্মে একটা ট্রেণ এসে লাগ্‌তেই আবার দু'বন্ধুতেই ট্রেণে উঠলুম।

আমরা যে কোন্ ষ্টেশনে নাম্‌ব তাও আমাদের ঠিক ঠিকানা নেই। টিকিটও কেনা হয় নি।

যাক্ হাতে যখন টাকা আছে তখন আর ভাবনা কি? না হয় ডবল ভাড়াই নেবে। তাতে আর কি? যদি কোন চেকার না আসে, তা হলে ত আর কোন ভাবনাই নেই। গেটকিপারকে একটা টাকা দিলেই আপদ চুকে যাবে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে একটা বেঞ্চীতে বসে পড়লুম। যে কামরায় আমরা উঠেছিলুম, সে কামরাটীতে লোক ছিল খুব কম। মাত্র ৪।৫টী যাত্রী ছিল। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই এক ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতে উঠে পড়ল আমরা দুই বন্ধু সেই মুহূর্ত্তেই ষ্টেশনে নেমে পড়লুম। আমাদের মনের কোণে একটা ভয় রয়েছে।

আমরা যে কাজের জন্যে যাচ্ছি, সে কাজ উদ্ধার হলে পরে যা হয় তা হবে।

ষ্টেশনে নেমে যাই বাইরে যাব অমনি গেটকিপার আমাদের ধরে ফেল্লে। অমনি তার পকেটে একটা টাকা গুঁজে দিতেই আমাদের দুজনকে ছেড়ে দিলে।

এবার আর ট্রেণে যাওয়া উচিত নয় মনে করে হাঁটা সুরু করে দিলুম।

তখন রাত প্রায় আট্টা হবে। এই রাত্রে কোথায় যাব তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কারণ সোণারহাটী গ্রামে হেঁটে যেতে হলে আমাদের পথঘাট জানা নেই। তবে একটা সুবিধা ছিল যে রেললাইনের পাশদিয়ে হেঁটে গেলে হয়ত পোঁছা যাবে। তাও আবার রাত্রিকাল, গ্রামের পথ ঘাটের যে কি অবস্থা, তা বোঝান কষ্টকর।

তবুও আমরা রেল লাইনের পাশ দিয়েই হাঁটা সুরু করে দিলুম।

সোণারহাটী গ্রাম সেখান থেকে অন্ততঃ ২৫।৩০ মাইলের কম নয়।

পায়ে হেঁটে গেলে অন্ততঃ ৮।৯ ঘণ্টা লাগ্‌তে পারে। রাত্রিটা তো কাবার হয়ে যাবে।

তাহলে তো আর আমাদের কোনই কাজ হবে না।

অন্ততঃ যদি রাত বারটায়ও পৌঁছা যায়, তাহলে হয়ত ধনরত্নগুলোকে উদ্ধার করতে পারব। সেখানে মাটী খুঁড়তেই তো অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে।

আমরা দু বন্ধুতে হেঁটে হেঁটে একটা ষ্টেশনের কাছে এসে পৌঁছিলাম।

"ভাই, একটা কাজ করা যাক্ না। এই ষ্টেশন থেকে ট্রেণে আরও দুটো ষ্টেশন এগোনো যাক্। পরে না হয় সেখান থেকে হেঁটে যাওয়া যাবে।"

রমেশের এই কথা কয়টী শেষ হতে না হতেই আমরা উভয়েই চম্‌কে উঠ্‌লাম। একটা আচম্‌কা শব্দে। পিছন ফিরে দেখি যে (কোথায়ও কিছু নেই) কি একটা ভারী জিনিষ হয়ত নিকটেই কোথায় পড়ে গেছে। আমরা যে যায়গাটাতে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিলাম্ সে যায়গাটা হ'তে ষ্টেশন প্রায় দু'শো হাত তফাৎ।

প্লাটফর্ম্মের উপর উঠে দেখি—সেখানে লোকজন মোটেই নেই। ট্রেণ আস্‌তে তখন ঢের দেরী। কাজেই তখন আর কোন লোকজন ছিল না প্লাটফর্ম্মে।

ট্রেণের টিকিট ক'রে প্লাটফর্ম্মেই ঘুরছিলাম। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। কোন একটী জনপ্রাণীর সাড়া

পেলাম না। টিকেট ঘরের মধ্যে মাত্র ষ্টেশন মাষ্টার আর একজন কুলী নাক ডেকে ঘুমুচ্চে।

ষ্টেশনটী খুবই ছোট। এখানে আবার সব ট্রেণ থামে না। মাত্র লোকাল ট্রেণগুলো আধ মিনিটের জন্যে প্যাসেঞ্জার বোঝাই করে নেয়। একে ত' রাত অনেক হয়ে গেছে। তাতে আবার ছোট্ট ষ্টেশন, কাজেই লোকজনের চলাচল আস্‌বে কোত্থেকে।

ট্রেণ এসে পড়বার আর বেশী দেরী নেই। ফ্লাগ ডাউন ক'রে দিয়েছে। আমাদের নজরটা ওই ফ্লাগের দিকেই ছিল বেশী। ফ্লাগ ডাউন হ'তেই আমরাও তৈরী হ'য়ে নিলুম ট্রেণে উঠ্‌বার জন্যে। যে গাড়ীতে লোকজনের ভীড় খুব বেশী, সেই গাড়ীতেই আমাদের উঠ্‌তে হ'বে। কারণ লোকজনের ভীড় বেশী থাক্‌লে তাতে করে আমরা গা ঢাকা দিতে পারব ভাল রকম। যদিই বা পরের ষ্টেশনে, সি, আই, ডি মোতায়েন থাকে, তাহলে তো আর সহজে আমাদের ধরতে পারবে না।

যাক্ ভালোয় ভালোয় ২টা ষ্টেশন পার হয়ে গেলাম। কোনও রকমের বিপদ আপদ আমাদের পাশ কাটাতে পারে নি।

যে ষ্টেশনে আমাদের নাম্‌বার কথা সেই ষ্টশনে এসে

পৌঁছবার কিছু আগেই মাঝপথে ট্রেণটা হঠাৎ থেমে গেল।

গাড়ীর সব লোকই থম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লুম। কোনও রকমের বিপদ আপদে পড়িনি ত'। গাড়ীর জানালার বাইরে মুখ বাড়াতে সাহস করলুম না। আমাদের বুকের ভেতর একটা কম্পনের সৃষ্টি হোল।

"আমাদের জন্যেই গাড়ী থামান নয় ত?" রমেশ বল্‌লে।

এতক্ষণ পরে রমেশের মুখদিয়ে একটা কথা বের হতে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। গাড়ীর অন্যান্য লোক যদি শুনে থাকে, তা'হলে তো আর আমাদের রক্ষে নেই।

"ওকি? প্রত্যেক গাড়ীর দরজায় উঁকি মেরে কি দেখ্‌ছে, কারও কি ছেলেমেয়ে হারিয়েছে?" এক ভদ্রালাক তা'র সাথীকে বল্‌ছেন। আমাদের কাণ খাড়া হয়ে উঠ্‌ল। রমেশকে ত ইসারা করতেই সে একটা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিলে।

'কি হয়েছে রে?"

রমেশ আমার কথায় কোনই জবাব না দিয়ে আমাকে ইসারায় জানিয়ে দিলে সেখান থেকে সরে পড়তে।

আমরা উভয়েই গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। রাত্রির অন্ধকারে নিজেদের গা ঢাকা দিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম আসল ব্যাপারটা।

"এই যাঃ! মিছামিছি আমরা এসেছি। একটা লোক ট্রেণ কাটা পড়ে মারা যাওয়ায় এই ট্রেণ থামানর কারণ। তুই এতক্ষণ কি দেখ্‌ছিলি?"
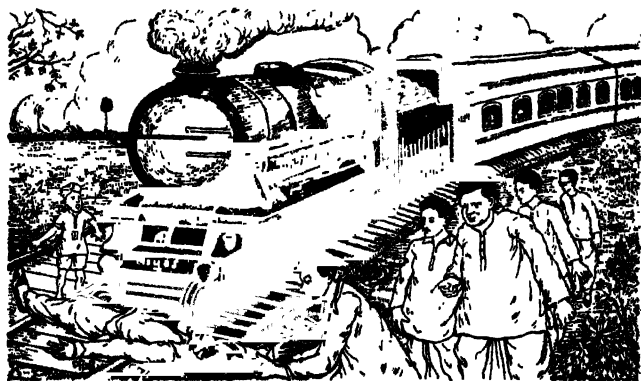
"আমি যা দেখেছি তা' ঠিকই।" ললিত বাবুকে আমি বেশ ভালভাবে চিনি। তাকে আমি জীবনে অনেকবার দেখেছি। তার বাড়ীর সকলের সাথেই আমি পরিচিত।"

"তবে কি তুই ললিত বাবুকে দেখেছিলি ?"

"হ্যাঁ। আমি ঠিক ললিত বাবুকেই গাড়ীর ও পাশটাতে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছি।"

রমেশের কথা শুনে আর অবিশ্বাস করতে পারলুম না। কারণ এইবার আমারও চোখে পড়ল, ললিত বাবুর মূর্ত্তিখানি। ২।১ দিন যা তা'কে দেখেছি। তাতেই তার চেহারাখানি আমার শরীরের প্রত্যেক অনুপরমাণুতে গাঁথা রয়েছে। তার মত ভয়ঙ্কর লোক আর নেই বল্‌লেও চলে।

আমরা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গাড়ীর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। আমরা সবই দেখ্‌ছি কিন্তু আমাদের কেউ দেখ্‌তে পায় নি। যে লোকটা ট্রেণে কাটা পড়েছিল, তার শবদেহ বাইরে টেনে বের করে দিলে।

একজন পুলিশ তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। অন্যান্য সব লোকই গাড়ীতে উঠে পড়ল।

আমরা আর গাড়ীতে উঠ্‌লুম না। কারণ যা' আমরা দেখেছি; তা'তে আমরা আর এ যাত্রা রেহাই পাব না, এটাই আমাদের বদ্ধমূল হল।

যে যায়গাটীতে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেই যায়গা

হতে আরও ছুটো ষ্টেশন পার হয়ে গেলে তবে আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারব। যদিও তখন মাত্র ৪।৫ মাইল তফাৎ।

এই ৪।৫ মাইল আমরা পায়ে হেঁটেই যাব ঠিক করে হাট্‌তে আরম্ভ করে দিলুম।

অন্ধকার রাতে রেল লাইনের পাশ দিয়েই আমরা চলেছি। কিন্তু কারও মুখ দিয়ে কোন কথা নেই। আমরা সমস্ত বিপদ আপদকে অগ্রাহ্য করে চলেছি। যে কোনও রকমের বিপদ এসে পড়ুক না কেন আমাদের মাথার ওপর, তাকে আমরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নেব।

রমেশ আমার চেয়ে ৩।৪ হাত দূরে একটা টর্চের আলোর সাহায্যে পথ করে নিচ্ছিলো।

হঠাৎ রমেশ থম্‌কে দাঁড়াল।

কারণটা জান্‌বার জন্যে আমিও একটু এগোলাম। রমেশের কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম যে তার সাম্নে দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। যাক্ তবুও রক্ষে যে রমেশ ওর গায়ে পা দেয় নি।

সাপটা আমাদের ডান পাশ দিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল।

আমরা একটা ষ্টেশনের কাছে এসে পৌঁছুতেই রমেশ

বললে—"ভাই লাইনের মধ্য দিয়ে না গিয়ে আমরা বাইরে দিয়ে যাই। যাতে আমাদের কোনও লোক দেখতে না পারে।"

রমেশের পরামর্শ মত আমরা লাইনের বাইরে দিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা পথ করে নিয়ে হেঁটে খানিকটা দূর গিয়েছি এমন সময় আমরা হঠাৎ একটা বিপদে পড়ে গেলাম।

একদল জংলী ডাকাত আমাদের সামনে ঝাপিয়ে পড়ল।

প্রথমে একটা লোক রমেশকে আক্রমণ করলে। রমেশও যে সে লোক নয়, রমেশের হাতে একখানি ছোরা ছিল। রমেশ সেই ছোরাখানি জংলী ডাকাতটার গায়ে ছুঁড়ে মারতেই আর একটা লোক তার হাতখানি চেপে ধরলে।

আমি তখন প্রায় ১০।১২ হাত পিছন থেকে এই দৃশ্য দেখে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমাকে বোধহয় ওরা কেউ দেখতে পায় নি। আমি আমার হাতের রিভলভারের ঘোড়া টিপতেই ডাকাত ব্যাটা মাটীতে পড়ে গেল।

একটা মোটা গাছের আড়াল থেকে গুলি ছুড়তেই অপর ডাকাতটা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এমন সময় আবার ১০।১২টী ডাকাত একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে।

বিপদে পড়লে তখন ভগবান ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারে না। আমিও স্বয়ং ভগবানের নাম স্মরণ করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ভয়েতে সব ডাকাতগুলিই পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাবার সময় ওরা রমেশের হাত থেকে ছোরাখানি নিয়ে গেল।

যাক্ তবুও রক্ষে যে আমার কাছে আরও একখানি ছোরা ছিল। কিন্তু গুলিতো অনেকগুলি চলে গেল। এখন মাত্র ৪।৫টী গুলি আছে। যদি আবার এইরকমই বিপদের মুখে পড়তে হয়, তা'হলে হয়ত আর আমরা রক্ষা পাব না ভেবে আমরা পালানই উচিত মনে করে দৌড়ে সেই জঙ্গলের মধ্য হতে বেরিয়ে পড়লাম। রেল লাইনের পাশ দিয়ে দৌড়ে এগোতে লাগ্‌লাম।

অল্পসময়ের মধ্যেই সোণারহাটী গ্রামে পৌঁছিলাম।

৭

— এদিকে —

ললিতবাবু তা'র জারিজুরি প্রকাশ করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে গেছেন।

অমিয়বাবুর কাছথেকে আমার ঠিকানা নিয়ে খোঁজ করে দেখ্‌লেন যে সে ঠিকানায় আমি নেই। তারপর আবার সুরু হোল আমার ঠিকানা খোঁজ করবার। দাদাকে তো আর আট্‌কাতে পারেন না। তাই আমি যেদিন খিদিরপুর থেকে রিভলভার সংগ্রহ করেছিলেম। সেদিন ললিতবাবু টের পেয়েছিলেন।

তারপর যা ঘটেছিল তা'তো আগেই বলা হয়েছে।

* * *

হ্যারিসন রোডের মেসবাড়ী খানাতল্লাসী করে যখন কিছুই পেলেন না, তখন তার একটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

তাই অমিয় বাবুকে সঙ্গে করে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ছুটে গেলেন।

ষ্টেশনে যখন আমাকে খুঁজে পেলেন না, তখন আরও ৩।৪ জন লোক নিযুক্ত করলেন হাওড়া পুলের ওপর। তারই মধ্যে আমারই বন্ধু অজিতকেও খবর দিয়ে আনা হল।

অজিত রইল ঠিক হাওড়া ব্রীজের গোড়ায়। অজিতকে যখন খবর দেওয়া হয়েছিল, তখন সে আদৌ জানতই না যে এই সব ব্যাপারের জন্যেই তাকে খবর দেওয়া হচ্ছে।

তারপর যখন সে জানতে পারলে যে আমি একটা ডাকাতির মতলবে ঘুরছি। তখন তার মনেও আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব জেগে উঠল। তাই সেও আমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে গেল।

আমি যখন রমেশকে নিয়ে ট্যাক্সি করে হাওড়া ব্রীজের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন অজিত আমাকে দেখে চিনতে পারে। সে অমনি ললিতবাবুকে খবর দিলেন।

তারপর আমরা যখন হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে পায়চারী করছিলেম, তখন ওরা কেউ সেখানে ছিল না। যদি ললিতবাবু বা অন্য কেউ সেখানে থাকত তা'হলে হয়ত আমাকে ধরে নিয়ে যেত থানায়। বোধহয় ভগবানই আমাদের রক্ষে করেছেন।

ললিতবাবু এসে যখন শুন্‌লেন যে ট্যাক্সিতে চড়েই সোণারহাটী গিয়ে পৌঁছব।

তাই না ভেবে অমিয়বাবুকেই পাঠালেন একটা ট্যাক্সি করে, আমাদের পেছু পেছু।

এদিকে অজিত আমাদের ট্যাক্সির নম্বর টুকে নিয়েছিলেন।

ললিতবাবু প্লাটফর্ম্মে পায়চারী করছিলেন, এমন সময় তার নজরে পড়ল একটা ট্যাক্সির নম্বরের উপর। সেই ট্যাক্সির নম্বর আর অজিতের টুকে নেওয়া নম্বর এক, অম্‌নি ছুটে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করতে ড্রাইভার বল্‌লে যে "বাবুলোক হিয়াই উত্তারা।"

ললিতবাবু বুঝে নিলেন আমাদের মনোভাব, তাই অজিতকে ও আরও ২টী লোকসহ ছুটে গিয়ে উঠ্‌লেন ট্রেণে।

একখানি ৩য়শ্রেণীর কামরায় মাত্র ৪টী প্রাণী। ললিত বাবু, অজিত আরও ২জন সি, আই-ডি। ট্রেণ হুহু শব্দে চলেছে সুদূর পাঞ্চালপ্রদেশ পর্য্যন্ত। পথে কত ষ্টেশন যে তার পার হতে হবে, তা'র তো সবগুলিরও নাম সব সময় মনে থাকে না। তবুও তার একটা প্রবল আশা

সব সময়ই সঞ্চিত থাকে যে গন্তব্য স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে পারবে।

তেমনি আমরাও আমাদের গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছেছি। এতদিন যে আশা আমাদের মনের কোণে সঞ্চিত ছিল। সেই আশার কতকটা অংশ আজ তবুও সফল হোল। যাক্ শেষপর্য্যন্ত আবার গোলপাকিয়ে না যায়।

*　　　*　　　*

আমরা যখন সোণারহাটী গ্রামে পা দিয়েছি, তখন রাত প্রায় সাড়ে বারটা হবে।

গ্রামের সকল লোকই তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বোধহয় বিড়াল কুকুরটী পর্য্যন্তও সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহখানাকে এলিয়ে দিয়েছে।

গ্রাম্যরাস্তাটী দিয়ে রামকুমারের বাড়ীর কাছটায় গিয়ে পৌঁছতে দেখ্‌লাম বাড়ীর দরজায় ৩।৪ জন লোক দাঁড়ান। প্রত্যেকের হাতেই একখানা করে লাঠী, মনে হোল যেন ওরা পুলিশ টুলিশ হবে। দূর থেকে ভাল করে দেখা যায় না।

আমরা দু'জনে পিছন ফিরে আস্‌তেই আবার দেখ্‌লাম

যে সদর রাস্তা হ'তে আরও দু'জন লোক আমাদের দিকেই আস্‌ছে।

এইবার আমাদের অবস্থা যে কি হ'ল তা আর বলে লাভ কি? আমাদের সাম্‌নে লোক, পিছনে লোক কোনও দিকে যাবার সাধ্যি নেই। ডানপাশে আবার পাশাপাশি ২।৩ খানা বাড়ী। বামপাশে জঙ্গল। বামপাশে আবার রাস্তার পাশদিয়েই সরু খাল। যদিও সেটা চওড়ায় একহাতের বেশী হবে না। সেই খালটা একলাফে পার হওয়া যায়। কিন্তু খালের অপর পাড়ে জঙ্গল, কত রকমের কাঁটা গাছ রয়েছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সেই জঙ্গল কাটানও কষ্টকর।

রমেশ আর কোনওরূপ উচ্চবাচ্য না করে বামপাশের সেই জঙ্গলের মধ্যেই লাফিয়ে পড়লো।

আমি যে কি কর্‌ব তাই কেবল ভাব্‌ছি। ততক্ষণে সেই লোক দু'টী আমাদের একেবারে কাছে এসে পড়েছে, মাত্র হাত পঞ্চাশেক তফাৎ, তখন আমিও লাফিয়ে পড়্‌লাম জঙ্গলের মধ্যে। লোক দু'টী আমাকে বোধহয় দেখে ফেলেছে। তাই রাস্তার মাঝখানেই থম্‌কে দাঁড়াল।

পরে কি যেন ভেবে আবার হাঁটা সুরু করে দিলে।

জঙ্গল অথচ কর্দ্দমময় পথের মধ্যে দিয়ে কোনও রকমে চলেছি। পেছনে বা চারপাশে কোনো লোকের সাড়া শব্দ পেলাম না। বন্য হিংস্রজন্তু সে জঙ্গলে থাকতে পারে না। কিন্তু সাপ তো থাকতে পারে। টর্চ্চের আলো ফেলে ফেলে সাম্নের দিকে কিছুদূর গিয়ে একটা গাছের ওপর উঠে পড়লুম। সেই গাছের ওপর থেকে রামকুমারের ঘরখানি দেখা যায়। টর্চ্চের আলো ফেল্‌লে যদি পুলিশের লোক টের পায়, তা'হলে আমাদের যে কি অবস্থা হবে তা মনেও আনা যায় না। আমরা সংখ্যায় মাত্র দু'জন, আর ওরা সংখ্যায় অন্ততঃ ১০।১২ জন। আমরা ওদের সাথে কিছুতেই পেরে উঠ্‌ব না। তাই টর্চ্চের আলো না ফেলে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখে নিলাম পুলিশদের কাণ্ড কারখানা।

রামকুমারের বাড়ীর আনাচে কানাচে সব যায়গা-টাকেই তন্নতন্ন করে দেখ্‌ছে, মাটী খুড়তেও বাকী রাখে নি।

আমরা গাছের ওপরই সারা রাত কাটিয়ে দিলুম, দিনের আলোতে তো আর থাকা যাবে না, তাই ভোর হ'তে না হ'তেই আমরা গাছ থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যেই

গা ঢাকা দিয়ে এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করতে লাগ্‌লাম।

পরদিন বেলা আটটা পর্য্যন্ত পুলিশের লোক রামকুমারের বাড়ীতেই মোতায়েন ছিল। সারা বাড়ীময় খুঁজেও যখন কোথায়ও কিছু টাকা কড়ির সন্ধান পেলে না, তখন তারা সকলেই সেখান থেকে চলে গেল।

আমরা কাছাকাছিই ছিলেম। ওদের গতিবিধি সকলই দেখ্‌ছিলাম।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আমাদের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল আর কি।

কি উপায়ে একবার রামকুমারের সাথে দেখা করা যায়? সব সময়ই আমাদের বাঁচিয়েছেন ভগবান। এবারেও তাই ভগবান আমাদের রক্ষা করলেন।

* * * *

সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে না খেয়ে কাটিয়ে দিলুম, রাত তখন প্রায় ৮টা, আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে —রামকুমারের ঘরের ঠিক পেছনে এসে থম্‌কে দাড়ালুম, ঘরের ভেতরে একটা পরিচিত স্বর শুনে। কে যেন বল্‌ছে—"বিনয় এসেছিলো কি? সে তো ২' দিন হয়

কল্‌কাতা থেকে এসেছে, তোমার এখানে। তোমার সাথে দেখা হয়নি বুঝি ?”

রমেশ আমায় চুপি চুপি বল্লে “এ যে তোর দাদার স্বর, তবে কি দাদা এখানে এসেছেন ?”

এইবার রামকুমারের স্বর শুনলুম—রামকুমার আধ আধ ভাষায় বল্‌ছে—“ডাক্তারবাবু। আমাকে বাঁচান, আপনি না হলে আর কেউ পারবে না, পুলিশের লোক আমাকে আর জ্যান্ত রাখ্‌বে না।”

রামকুমারের মুখ দিয়ে “ডাক্তারবাবু” কথাটী শুনে আমার মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না যে এ আমার দাদা ছাড়া আর অন্য কেউ।

তাড়াতাড়ি করে ঘরের বারান্দায় উঠে একেবারে সরাসর রামকুমারের বিছানার কাছে। তখন রামকুমারের জীবনলীলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দাদা তার নাড়ী ধরে আছে। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে শ্বাসের টান হয়েছে। বোধ হয় আর বেশীক্ষণ টিক্‌বে না।

দাদাকে দু’একটা কথা বলে আমরা দুজনে সেখান থেকে বেড়িয়ে গেলাম।

কল্‌কাতায় ফিরে যাওয়াই উচিত মনে করে ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলুম। রমেশ বল্লে—“ভাই একটা কাজ

করা যাক্, কল্‌কাতা ফিরে না গিয়ে—আমাদের দেশের বাড়ীতেই চল্ না।”

রমেশের কথা মত কল্‌কাতায় না গিয়ে রমেশদের দেশের দিকেই যাওয়া ঠিক কর্‌লাম।

রমেশদের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলায়। বর্দ্ধমান ষ্টেশনেরই আগেকার ষ্টেশনে।

টিকিটঘরে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে গাড়ী আস্‌বার সময়টা জেনে নিলুম। ট্রেণ আসতে তখনও অনেক দেরী। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নি। ক্ষিধের চোটে পেট—খা-খা—কর্‌ছে। ষ্টেশনের কাছাকাছি কোন হোটেলও নেই যে কিছু খেয়ে নেব।

পাঁড়াগায়ের ষ্টেশন, তাতে আবার সেই ষ্টেশনটী একেবারেই ছোট। সেখানে না আছে একটা টি-ষ্টল, না আছে একটা পান-বিড়ির দোকান। একে ত’ তখন রাত ৯টা বেজে গেছে। পাঁড়াগায়ে রাত ৯টার সময় কল্‌কাতা সহরের রাত ২টার সময়ের মতও নয়। লোক-জনের ভীড় তো মোটেই নেই।

ষ্টেশনের কুলীটা তো প্লাটফর্ম্মের এক পাশে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ষ্টেশন মাষ্টার মশাই তার হিসাবপত্র নিয়েই ব্যস্ত। রাত দশটার গাড়ী

চ'লে গেলে তিনিও এক লম্বা ঘুম দিয়ে নেবেন অবশ্য।

ষ্টেশনের কুলীটাকে সজাগ করে তার কাছে এক গ্লাশ জল চাইলুম, কুলী ব্যাটা তো একটা হুঙ্কার দিয়ে আবার চোখ বুজ্‌লে।

এক গ্লাশ জল খেয়ে পিপাসা নিবারণ কোরবো তাও আবার কুলী ব্যাটার খোসামুদি। এ আমার ভাল লাগ্‌লো না। তাই জল খাওয়ার সখটাকেও ইস্তফা দিলুম। পকেটে টাকা থাকতেও ক্ষিদের কষ্ট পেতে হবে।

রমেশ আমাকে কিছু না জিজ্ঞেস্ করেই কুলী ব্যাটাকে আবার সজাগ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। একটা সিকি দেখিয়ে তার কাছে কিছু খাবার চাইলে। এইবার কুলী মহারাজ চোখ রগড়াতে সুরু করে দিলে। তার সে চোখ রগড়ানোর ভাব দেখে রাগে আমার সারা গা রি রি কর্‌ছিল। তখনই ওকে এক ঘা বসিয়ে দিতেম যদি তখন ষ্টেশন মাষ্টার মশাই টিকিট ঘর থেকে বেরিয়ে তার চশমা জোড়ার ফাঁক দিয়ে "এই রামভজন্" বলে চীৎকার না পাড়তেন। রামভজন তো এইবার ধড়-ফড়িয়ে উঠে পড়ল। "যো হুকুম হুজুর। মাপ্ কি

জীয়ে।" এই বলে মাষ্টার মশাইএর কাছে হাজির হল। মাষ্টার মশাই তো তেলে বেগুনে জ্বলে একেবারে ছ্যাৎ করে উঠ্‌লেন।

"তোম্‌ কেয়া করতা হ্যায়? বসে বসে ঝিমাতা হ্যায়, আর বাবু। মাফ্‌ কি জীয়ে। উল্লুক কাহেকা। ব্যাটা আমার বাত শুন্‌তা নেহি। হাম্‌ উপরমে তুম্‌কো নামে রিপোর্ট করতা হ্যায়।"

এই বলে মাষ্টার বাবু গজ্‌ গজ্‌ কর্‌তে করতে তার রুমে ঢুকে পড়্‌লেন। ফিরবার সময় ঘাড়খানিকে একবার আমাদের দিকেও ফিরিয়েছিলেন, এমন কি সেই চশমা জোড়ার ফাঁক দিয়ে আমাদের আপাদ মস্তক দেখে নিলেন। তার সে চাহনির অর্থ আমি যে একটুও টের না পেয়েছিলুম এমন নয়। রমেশ কিন্তু এর কিছুই বুঝ্‌তে পারেনি। তাই রমেশ তখনও এক গ্লাশ জল আর রামভজনের কাছ থেকে ভাল ভাল খাবার পাবার আশায় দাড়িয়ে রইলো।

আমি আর সে যায়গায় দাড়ানোটা উচিত নয় মনে করে প্লাটফর্ম্মের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লুম।

আমার দৃষ্টি সেই টিকিট ঘরের দিকেই। রমেশ তো

আমার মত ভুক্তভোগী নয়, তাই সে সেই একই যায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এদিকে মাষ্টার মশাই ঘরের ভেতর ঢুকে রামভজন্‌কে কি যেন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌ছেন, আবার মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছেন।

যাহা বায়াম্ন, তাহা তেপ্পান্ন এই না ভেবে বেঞ্চি থেকে উঠে রমেশের কাছে গিয়ে তাকেও সতর্ক করে দিলেম।

আমার কথা শুনে রমেশের তো চক্ষু স্থির। সেও কি যেন ভাব্‌ছে কিন্তু এক পা ও নড়ছে না। বোধ হয় আমার কথা ওর কানে যায়নি, তাই না ভেবে আমিও তাকে একটা ধাক্কা দিলুম। আমার ধাক্কাটা খেয়ে ও তো হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো আর কি। যদি না তখন রামভজন এসে ধরে ফেল্‌ত।

"বাবুজী পানী পিয়েগা ?"

"হ্যাঁ পানী পিয়েগা না তোমার মুণ্ডু খাওগো। হাম্‌লোক্‌কে ক্ষিদেমে পেট্‌ জ্বল্‌ যাতা হ্যায়, আর তুম্‌ ব্যাঠ্‌ কর্‌কে চোখ রগড়াতা হ্যায়।" রমেশ একটু রাগের সহিতই এই কথাগুলি বল্‌লে।

রমেশের কথা শুনে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছিল। কারণ ওর রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না ও একেবারে অনর্থ বাধিয়ে তবে ছেড়ে দেয়।

৮

এদিকে সেই দিনই রাত ৯টার সময় হাওড়া ষ্টেশনের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের দরজার সাম্‌নে এক ভদ্রলোক একখানি ছড়ি হাতে পায়চারী করছিলেন আর কি যে আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিলেন।

"কি যে দিন রাত্তির তুই ভাবিস্‌ তা আমি বুঝে ঠিক করে উঠতে পারি না। যা সাম্‌নের উপর পড়বে তাকেই আঁকড়ে ধরে একটা না একটা সূত্র বের করতে হয়। আমার কথা না শুনে আজ তোকে হার মান্‌তে হয়েছে। মাঝখান দিয়ে, আমাকেও তুই নাস্তা নাবুদ করে তবে ছাড়লি।"

"হ্যারে অমিয়! তুই কি বল্‌তে চাস্‌ যে ওর বাড়ীতে কোথায়ও টাকা পয়সা লুকান আছে। আর যদিই বা থেকে থাকে, তা আজ ১৪।১৫ বছর সে কি আর পড়ে আছে, কেউ হয়ত তুলে টুলে নিয়েছে। আমরা তো কোন যায়গা বাদ রাখি নি।"

ললিতবাবু অমিয়কে এই কথাগুলো বলে অনেকটা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, কিন্তু তার মনের ধারণা এখন পর্য্যন্তও

লোপ পায় নি যে টাকা পয়সা ধনরত্ন কোথায়ও আছে। যদিই বা থেকে থাকে তাও হয়ত অনেক মাটীর নীচে।

অমিয়বাবু বাইরে যতই বলুক না কেন? সেও যে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে না গেছেন এমন নয়। আমাকে যে রিভলভার সহ ধরতে পারে নি, এটাও তার পক্ষে একটা পরাজয়ের কথা।

'ললিত!' একটা কাজ করা যাক্। আমরা দু'জনেই ছদ্মবেশে রাত্রে রামকুমারের ঘরের পেছনের গাছগুলি গোড়ায় একটা খোঁজ করিয়ে দেখি না কেন! একটা ট্রাই বই তো নয়।"

অমিয়র কথা শুনে ললিতবাবুর মন কিছুতেই বুঝ মান্‌ছে না। তাই তিনি সেখানে বসে না থেকে সোণারহাটী যাওয়াই সঙ্গত মনে করলেন।

অমিয়বাবু ও ললিতবাবু ট্রেণের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বস্‌লেন।

দু'জনে কত সব বাজে গল্প জুড়ে দিলেন। ট্রেণ ছাড়্‌ল হু হু শব্দে। কামারহাটী ষ্টেশনে পৌঁছিতে তো আর বেশী সময় লাগ্‌বে না। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল।

ট্রেণ [illegible]হাটা ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমরাও দু' বন্ধুতে সেই ট্রেণে উঠে বর্দ্ধমান যাব ভেবে একখানি গাড়ীতে পা বাড়াতে যাব, এমন সময় পিছন দিক থেকে কে যেন ডাক্‌লে—"মশায় শুনুন না। আপনার নামটা কি একবার জিজ্ঞেস্ করতে পারি ?"

ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে কেমন খট্‌কা বেধে গেল, তাই প্রথমটায় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেম। পরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মুখদিয়ে আর কোন কথাই বের হোল না। আমি সেখান থেকে পালাব কি তার প্রশ্নের উত্তর দেব, কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারলুম না। এমন সময় আবার আর একটা ব্যাপার ঘট্‌ল, সেটা একেবারেই অস্বাভাবিক।

আমার একখানি পা গাড়ীতে আর একখানি পা প্ল্যাট ফর্ম্মে। আমার সাম্নেই দাঁড়ান—বাঙ্গালাদেশের নামকরা ডিটেক্‌টিভ ললিত চাটুয্যে।

হাত দশেক তফাতে একটা লোক চোর চোর বলে চীৎকার পাড়্‌তে সকল লোকের চোখ গিয়ে পড়ল সেই লোকটার ওপর। সেই লোকটা দৌড় দিতেই তাকে সকলে ধরে ফেল্লে। চোরের পিঠের ওপর দিয়ে অজস্র কিল চড় বয়ে গেল। চোর ব্যাচারীর

দিকেই সকলে ঝুকে পড়্‌ল। আমি এই অবসরে সেখান থেকে সরে পড়লাম। সেখানে বহুলোক জড় হয়েছে। কাজেই আমিও ভীড়ের মধ্যে যোগ দিলেম। রমেশতো আগে থেকেই দূরে দূরে ছিলো।

সাম্‌নে থেকে শিকার পালালে শিকারীর যে অবস্থা হয় ললিতবাবুরও সেই দশা হল। আমি আড়াল থেকে ললিতবাবুর গতিবিধি লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম, যে তিনি আর প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে না থেকে গাড়ীর একখানি ৩য় শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়লেন।

ট্রেণ ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেলে রমেশকে খুজে বের করলাম। তখনও প্লাটফর্ম্মে ২।৪ জন লোক ছিল।

আমরা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলাম রামকুমারের বাড়ীর দিকে। এইবার আমাদের কার্য্য সমাধা করায় আর কোন বাধা বিপত্তি থাক্‌তে পারে না।

কারণ ললিতবাবু যখন ট্রেণেই উঠ্‌লেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাকে খোঁজ করবেন সব গাড়ীতে। এতো আর ২।৪ মিনিটের কাজ নয়। অন্ততঃ দু'ঘণ্টার কমে হবে না। আমরা একঘণ্টার ভেতরেই আমাদের কাজ সেরে নেব।

রামকুমারের বাড়ীর পেছনে গিয়ে যখন পৌঁছেছি

তখন রাত দশটা বেজে গেছে। ক্ষুদ্র গ্রামখানির কোথায়ও একটী জনপ্রাণীই সজাগ আছে বলে মনে হয় না।

কাঁঠাল গাছটীর গোড়ায় গিয়ে আবার একটা মুস্কিলে পড়লাম, কি দিয়ে মাটী খুড়ব ?

বাড়ীর চারধারে ঘুরে ঘুরে একখানি কোদাল পাওয়া গেল, সেই কোদালিখানা দিয়ে মাটী খুরতেই, প্রায় ৩।৪ হাত মাটীর নীচে কোদালীখানা ঠন্ করে উঠ্ল।

আমাদের তখন স্ফূর্ত্তি দেখে কে ? একে তো আমাদের তখন পুলিশের ভাবনাই ছিল না। তার উপর আবার এতদিনকার আশা পূরণ হবার জোগাড়ও হয়ে এসেছে।

যাক্ একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি, সে হাঁড়িটা ওজনে ২।৩ মণের কম হবে না। সেই হাঁড়িটা আমরা দু'জনে কেমন করে বয়ে নেব।

মাটীর নীঁচ থেকে ওপরেই বা তু'লব কেমন করে ?

হাঁড়ির চার পাশের মাটী সরিয়ে নিয়ে যদি ওকে উপরে উঠান যায়, তাই ভেবে চারপাশের শিকড়গুলিকে

কেটে ফেল্লাম। হাড়িটীর চার পাশেই গাছের শিকড় ছেয়ে গিয়েছে।

হাঁড়ির মুখটা আবার ঢাকা। করগেটের সিট দিয়ে মুখটাকে ভাল করে বেঁধে রেখেছে। বহুদিন পর্য্যন্ত মাটীর নীচে থাকায় করগেট খানিও একেবারে কালীর মত কাল হয়ে গিয়েছে।

“ভাই, ছোরা দিয়ে খুব আস্তে আস্তে পাতখানিকে কেটে ফেলা যাক্। তারপর ওর ভেতরের কতকটা জিনিষ উঠিয়ে নিলেই ভার কমে যাবে। তখন না হয় দু'জনে ধরে হাঁড়িটীকে উপরে উঠাব।” রমেশের পরামর্শ মত আমার ছোরাখানি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঢাকনীটিকে খুলে ফেল্লাম।

হাঁড়ির ভেতরে তখন সোণার অলঙ্কারগুলি ঝক্ ঝক্ করে জ্বল্‌ছিল। তার ভেতরে অধিকাংশই গিনী সোণার গহনা।

হাঁড়ির ভেতরে হাত দিয়ে সোণার গহনাগুলি উঠাতে গিয়ে একটী ছোট কাঠের বাস্ক পেলাম।

সেই কাঠের বাস্কটী খুলে দেখ্‌বার জন্যে আমার একটা প্রবল আকাঙ্খা ঘাড়ে চেপে বস্‌ল।

বাস্কটীকে খোলা যায় কেমন করে? রমেশ আমার

হাত থেকে বাক্সটীকে কেড়ে নিলে। নিয়েই তা ভেঙ্গে ফেল্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বাক্সটী ভেঙ্গে গেল। আমি ভেবেছিলেম যে এই বাক্সটীর মধ্যে না জানি কোন একটা দামী গয়না টয়না হবে। কিন্তু এ কী? একখানা ছোট্ট নোট বই। আমি তো অবাক্ হয়ে গেলাম। একখানা নোট বইএর জন্যে আবার একটী বাক্সের দরকার হয়েছে।

যাক্ দেখা যাক্ এই নোট বইখানার ভেতরে কি লেখা আছে? নোট বইখানা একটী লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা। যদিও ফিতাটী তখন একেবারে কালো হয়ে গেছে।

ফিতাটী ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নোট বইখানি খুলে পড়তে আরম্ভ কর্‌লাম।

রাতের অন্ধকারে সে অক্ষর চেনাও তো কষ্টকর। তাতে যদিই বা টর্চ্চের আলোর সাহায্যে পড়ি তবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাবে। তাই নোট বইখানাকে পকেটে রেখে বাক্সটীকে ফেলে দিলেম। হাঁড়ির ভেতর থেকে প্রায় সকল সোণাই উপরে এক যায়গায় জড় কর্‌লাম। এখন নেই কেমন করে? ওজনে তো আর কম হবে না।

হাঁড়িটাশুদ্ধ নিলে আমাদের পথে ধরে ফেল্‌বে। তাই আমি এবং রমেশ উভয়েরই গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলে তার ভেতরে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল্‌লাম।

এখন আমরা দুজনে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে পারব। না হয় একদিন কুলী সাজা গেল।

সে যায়গা আর বেশী সময় কাটান যুক্তিযুক্ত মনে কর্‌লাম না। তাই চটপট আমাদের কাজ সেরে নিয়ে খালিগায়ে মাথায় এক একটা বোঝা নিয়ে রওয়ানা হলাম কল্‌কাতার উদ্দেশে।

আমার ও রমেশেরমধ্যে মোটামোটী একটা ভাগ বাটারা হয়েছিল। হয়ত কারও ভাগে বিছু বেশী, হয়ত বা কারও ভাগে কিছু কম পড়েছে, তাতেই বা কি এসে যায়। আমরা এক এক ভাগে যে টাকার সোণার গয়না পেয়েছি তাতে আমাদের এক একটা জীবন বেশ রাজার হালে চলে যাবে।

রাতের অন্ধকারে গয়নাগুলি ভাল করে দেখ্‌তে পারলাম না। তবে নোট বইখানি আমিই রেখেছিলেম। এখন কি ভাবে কল্‌কাতায় ফিরে যাব। কোন মতলবই মাথায় টিক্‌ল না।

হঠাৎ আমাদের সাম্নে পড়ল, একটা কাগ্‌জী লেবুর

গাছ। সেই গাছটীতে অনেক লেবু রয়েছে। অমনি মাথা হতে বোঝাটা নামিয়ে কতকগুলি লেবু সংগ্রহ করে নিলাম।

এমনভাবে লেবুগুলিকে লইলাম যে বাইরে থেকে কেউ সন্দেহ না করতে পারে যে এই বোঝার মধ্যে লেবু ছাড়া আরও কিছু থাক্‌তে পারে। এখন তো আমাদের আর কোনই অসুবিধা নেই। কল্‌কাতা গিয়ে কুলীর মাথায় চড়িয়ে দিলেই হবে। আমাদের গায়ে একটা করে গেঞ্জী আছে। পড়নের কাপড়খানিকে একটু ময়লা করে নিতে আর কোন কষ্ট হবে না। কারণ পথিমধ্যে মাঠের এক যায়গায় বসে নিলেই কাপড় ময়লা হয়ে যাবে।

আমরা কামারহাটী ষ্টেশনে না গিয়ে অন্য কোন ষ্টেশনে উঠ্‌ব। এইরূপ মনস্থ করে গ্রামের মধ্য দিয়েই সোজাসুজি পূবদিকে হাটা সুরু করে দিলেম।

ভোর ৪টার সময় কল্‌কাতায় একটা ট্রেণ এসে পেঁাছে। যারা সাধারণতঃ তরকারীর ব্যবসা করে, তারা ঐ গাড়ীতেই আসে। আমরাও তো এখন লেবুর ব্যবসাদার।

প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ধরে হাট্‌তে হাট্‌তে যে ষ্টেশনটীতে

এসে পৌঁছিলাম। সেই ষ্টেশন হ'তে ট্রেণে উঠ্‌লেই আমরা ঠিক সময় কল্‌কাতা পৌঁছিব। ট্রেণ আস্‌তেও বেশী দেরী নেই।

টিক সময় মতই ট্রেণ এসে পড়ল। আমরাও দুজন লেবুর ব্যবসায়ী একটা ৩য় শ্রেণীর কামরায় উঠে বস্‌লাম। সেই গাড়ীতে আরও ২।৩ জন লেবুর ব্যবসায়ী ছিল।

"ভাই, এখন যদি ওরা আমাদের কাছে লেবুর দরের কথা জিজ্ঞেস করে, তা হলে কি বল্‌বি? শেষকালে যদি আমরা ধরা পড়ে যাই, তখন তো আমাদের চোর বা ডাকাত বলে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে। তখন কি উপায় হবে?"

রমেশের কথা শুনে আমারও ভাবনা হয়ে গেল, এখন কি করা যায়। যাক্ কোনও রকমে চুপ্ চাপ করে রইলাম। কারও সাথে কোন কথা নেই, বার্ত্তা নেই, এই ভাবে বেশ নির্ব্বিবাদে কল্‌কাতা পর্য্যন্ত আসা গেল।

কল্‌কাতা এসে একটা রিক্সাতে উঠে পড়লুম।

প্রথমে রমেশদের বাসায় পৌঁছে একটা কুলীর মাথায় করে ব্রজনাথ দত্ত লেনের সেই বাসায় গিয়ে উঠলুম।

তখন ভোর হয়নি। পাড়ায় কেউ আমাকে দেখ্‌তে

পায় নি। আমিও বাসায় না বসে একটা জামা আর সেই নোট বইখানি নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

ইডেন গার্ডেনের মোড়ে যখন পেঁাছেছি, তখন পাঁচটা বাজল। পার্কের মধ্যে ২।৪জন লোকও ভোরের হাওয়া খাচ্ছিল। একটা খালি বেঞ্চী দেখে সেখানে বসে সেই নোট বইখানি খুলে পড়তে আরম্ভ করলুম, প্রায় একঘণ্টা লাগ্‌ল পড়তে।

যে ধনরত্ন আমরা পেয়েছি—সেই ধনরত্ন যিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর নিজেরই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে তারপর অনেকগুলি উপদেশ দিয়েছেন।

নোট বইতে যা লেখা ছিল তার মর্ম্ম এইরূপ।

তাঁর নাম ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ঐ সোণারহাটীতেই তার পূর্ব্বপুরুষরা কাটিয়ে দেন। তিনি তার প্রথম জীবনে ব্যবসা করে বহু টাকা আয় করেন। তার মধ্যে তিনি সোণার গহনার দিকেই দৃষ্টি দিতেন বেশী। ক্রমে ক্রমে বন্ধকী কারবারও করেন। তার সেই অগাধ টাকা দেখে অনেকেরই হিংসা হয়েছিল, তাই মাঝে মাঝে ডাকাতিও হোত। তিনি সাধারণতঃ গহনাগুলি মাটীর নীচে লুকিয়ে রাখ্‌তেন।

একবার তার পরিবারের মধ্যে অনেকেই মারা যায়—

মহামারী রোগে। ২।৩টী ছেলে মেয়ে নিজের চোখের সামনে একই সময় মারা যাওয়ায় তিনি শোকে প্রায় পাগলের মত হয়ে যান। তখন চোর ডাকাতেরও পোয়াবার তের। ডাকাতি করতে তো কোনই অসুবিধে নেই। নগদ টাকা কড়ি যা ছিল তারও প্রায়ই শেষ করেছে।

একটা মাত্র ছেলে সেও ত বয়েসে অনেক ছোট। কবে বড় হবে? কবেই বা বংশ উজ্জ্বল করবে। এই ভাবনায়ই তার চুল পেকে গেল। এদিকে ডাকাতরা তো ছেড়ে দিচ্ছে না। বুড়ো বয়েসে তো আর গায়ে শক্তি নেই যে ডাকাতদের সাথে লড়বেন। তাই প্রত্যেক ডাকাতিতেই কিছু কিছু টাকা যেতে লাগ্‌ল। আমাদের বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে জ্ঞাতি শত্রু ভয়ঙ্কর। তাই, তারও এক জ্ঞাতি শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সে ছিল আবার একটা ছোট খাটো ডাকাতদলের নেতা। সেই তাকে বেশী সর্ব্বনাশ করত।

শেষকালে একদিন তাঁর স্ত্রীও চোখ বুজ্‌লেন। ছেলে তো তখন নাবালক। তার হাতে যদি ধন ভাণ্ডারের সন্ধান দেওয়া যায়, তবে সে তো দু'দিনেই উড়োবে। তাই তাকেও বলে যাননি ধনভাণ্ডারের কথা।

তারপর আবার তার জীবনে আর একটা পরিবর্ত্তন হোলো। ছেলেটাকেও ডাকাতদল লুকিয়ে রাখ্‌লে। বোধ হয় ধন ভাণ্ডারের খবর পাবার জন্যে।

একটী মাত্র পুত্র, তাও চলে গেল। অনেকদিন পর্য্যন্ত তার দেখা না পেয়ে তিনি সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। ডাকাত বা জ্ঞাতি শত্রুরাই লুটিয়ে নিয়ে যাক্। তবে এই ধন-ভাণ্ডার যদি কোনও ভাল লোকের হাতে পড়ে তিনি যেন তাঁরই উদ্দেশে একটা দেব মন্দির তৈয়েরী করান, ইহাই তাঁর বাসনা।

* * *

নোট বইর আগাগোড়া পড়া হয়ে গেলে আমার মনে পড়ে গেল সেই বহুদিনের পুরাতন কথা। ছোট বেলায় আমার বাবা মারা যান। তখন আমার বয়েস ছয় কি সাত। বাবার চেহারাটী মাত্র মনে আছে। কিন্তু তার কথা ভাল করে আমার মনে নেই। পিসিমা ও মার নিকট—আমার বাবার যে ইতিহাস শুনেছি, সেই ইতিহাসের সাথে এর একটা মিল আছে।

আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল।

পিসিমার কাছে বহুবার শুনেছি যে তার মা ও বাবা আমার বাবাকে নিজের ছেলের মত দেখ্‌তেন। সেই থেকে পিসিমাও তার নিজের আপন ভাইর চেয়ে আমার বাবাকে বেশী ভালবাস্‌তেন। পিসিমারও কোন মায়ের পেটের ভাই ছিল না। আমার ঠাকুরদাদার নামও ছিলো বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

আমি আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে আমার পিসিমার কাছে ছুটে গেলাম। এই বারে তো আর আমার কোন ভয় নেই। এ টাকার তো নেহ্য উত্তরাধিকারী আমিই।

পিসিমা নোট বইর লেখা আগাগোড়া শুনে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আমাদের বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া হল। আমার মা ছুটে এলেন কল্‌কাতায়। তারপর আর আমায় পায় কে ?

* * * *

সারাটা দিন বেশ স্ফুর্ত্তিতেই কেটে গেল। টেলিগ্রাম করে দেওয়া হোল, আমাদের 'দেশে মাকে আনবার জন্যে। এতদিন যে পুলিশের লোকদের ভয় করছিলাম ভয়টা এখন কেটে গেছে। অজস্র ধন-দৌলতের মালিক হওয়ায় মনটা কোনও রূপ পরিবর্ত্তন হয়নি, শুধু আমার

পূর্ব্বপুরুষের আমলের সঞ্চিত বলে মনটা বেশ একটু সবল হয়ে উঠ্ছিলো।

দাদাতো মহা খুশী, কিন্তু দাদা খুসী হলে কি হয়? বৌদি কিন্তু খুসী হন্নি মোটেই। বাইরে তিনি দেখিয়েছেন ভ্রাতৃস্নেহ আর ভেতরে কর্ছেন হিংসা। খুব ভাল করে তার মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখ্লেই মনে হয়।

যাক্ রোজকার মত সেদিনও রাতের খাবার সেরে নিলুম একটু শীগগির করে। দাদাতো কল্এ গেছেন, বৌদিই বা বসে থাক্বেন কেন?

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে বসে বসে বই পড়া বা স্কুল কলেজের ভাবনায় আমার একটু চিন্তিত থাকা, এ আমার চিরকালের অভ্যেস।

যাক্ সে সকল কথা—চিরকালের অভ্যাসটাকে বজায় রেখে একটু ছাদের ওপর পায়চারি কর্তে লাগ্লাম। কত রকমের চিন্তা ভাবনা এসে আমার মনটা অধিকার করে বস্ল।

রাত তখন প্রায় এগারটা হবে, আমি আকাশের অগনিত নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, আমার মনে পড়ে গেল, সেই ছেলেবেলাকার কথা। যখন

আমার বাবা জীবিত ছিলেন, তিনি আমায় কত আদর করতেন। একদিন কি একটা জিনিষের জন্যে বায়না ধরেছিলেম বাবার কাছে আমার সে আব্দার তিনি রক্ষা করতে পারেননি বলে তাঁর চোখের কোণ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। কত অভাব অভিযোগের মধ্যে থেকে বাবা আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তারপর বাবা মারা যাওয়ার পর ও যে কি ভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে কল্‌কাতায় পড়তে এসেছিলেম।

ছাদের রেলিংএ হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছি আর এই সব চিন্তা আমার ঘাড়ে চেপেছে, এমন সময় সেই ছাদেরই কোণে একটা কালো ছায়া আমার দিকেই আস্‌ছে। আমি যেন হতভম্বের মতো তার দিকেই তাকিয়ে রইলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বা এটা আবার কি? এ কি ভূত না মানুষেরই প্রেতাত্মা। আমি কি নিদ্রিত না জাগ্রত। চোখ দুটাকে একবার রগড়ে নিলুম। এবার ছায়ামূর্ত্তি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

ছায়া মূর্ত্তি আমায় বল্‌লে—"দাদু আমার! ভাই আমার! আমার বংশের একমাত্র রতনমণি! এতদিন আমি আমার সঞ্চিত ধনরত্ন আল্‌গিয়ে রেখেছিলেম। শুধু তোরই জন্যে। তোকেও আমি কত কষ্ট দিয়েছি।

তবে আমার জ্ঞাতি শত্রুই আমাকে সর্ব্বনাশ করেছে। জ্ঞাতির বংশধর রামবুমার সারা জীবন কত পাপকার্য্য করেছে; তার শাস্তি বেশ পেয়েছে। কিন্তু সে আমার ধনরত্নের কাছেও যেতে পারেনি। তোর কাছে আমার একটী মাত্র অনুরোধ যে আমি যাতে এই পরলোকে বসে একটু শান্তিতে থাক্‌তে পারি, তার ব্যবস্থা করিস্। আমার ও তোর বাবার পারলৌকিক কাজ করতে কোনও বাধা করিস্ না। এই ধনরত্ন দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিস্ না। এই-ই আমার অনুরোধ।"

ছায়া মূর্ত্তি আমাকে জানিয়ে দিলে সেই যে আমার পিতামহ। আমিই ত তার একমাত্র বংশধর।

তার পর থেকে আমার আর কোন দুঃখ কষ্ট রইলো না। আমি বেশ সুখেই কাটিয়ে দিলাম।

শেষ